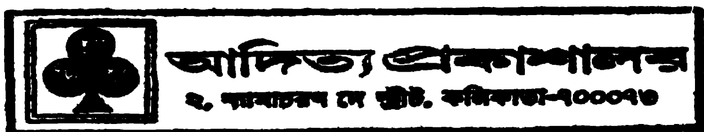
কমলাকান্তের দপ্তর

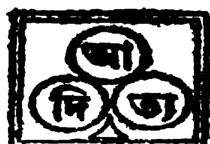
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



কমলা কান্তের দপ্তর

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়





মার্চ, ১৯৬০

প্রকাশক :
শ্রীহরিপদ বিশ্বাস
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর :
শ্রীনিতাই জানা
জয়তারা প্রেস
৩৫/সি, গোয়াচাঁদ বোস রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

কমলাকান্তের দপ্তর

প্রথম সংখ্যা

একা

"কে গায় ঐ ?"

বহুকাল-বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন? এই সঙ্গীত যে অতি সুন্দর এমত নহে, পথিক পথ দিয়া আপন মনে গাহিতে গাহিতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনে আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর; মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনের সুখের মাধুর্য বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলি স্পর্শের ন্যায় ঐ গীতধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করে কেন?

কেন কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী-সৈকত কৌমুদী হাসিতেছে। অর্ধাবৃতা সুন্দরীর নীলবসনের ন্যায় শীর্ণশরীরা নীল-সলিলা তরঙ্গিনী সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন; রাজপথে কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়, বৃদ্ধা বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সঙ্গীতে আমার হৃদয়-যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।

আমি একা, তাই এই সঙ্গীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্যে ঐ আনন্দময় অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া এই বিশাল আনন্দতরঙ্গতাড়িত জলবুদ্‌বুদ্‌সমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্‌বুদ্‌ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র, আমি বারি বিন্দু, এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

তাহা জানি না—কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে

তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধী, কিন্তু যদি ঘ্রাণগ্রহণকর্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধী হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্যে ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুম প্রস্ফুটিত করিও।

কিন্তু বারেকমাত্র শ্রুত ঐ সঙ্গীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেকদিন আনন্দোত্থিত সঙ্গীত শুনি নাই—অনেকদিন আনন্দানুভব করি নাই। যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্র-মর্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রারোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্য-মুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, মনুষ্য-চরিত্র এখনও তাই আছে, কিন্তু এ হৃদয় আর তার নাই। তখন সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ হইত, আজি এই সঙ্গীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায় যে সুখে সেই আনন্দ অনুভূত করিতাম, সেই অবস্থা সেই সুখ মনে পড়িল। মুহূর্তের জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া মনে মনে সমবেত বন্ধুমণ্ডলীমধ্যে বসিলাম, আবার সেই অকারণসঞ্জাত উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া এখন বলি না, নিষ্প্রয়োজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম, আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল—তাই এ সঙ্গীত এত মধুর লাগিল। শুধু তাই নয়! তখন সঙ্গীত ভাল লাগিত,—এখন লাগে না,—চিত্তের সে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত; সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবন-সুখচিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্বস্মৃতিসূচক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।

সে প্রফুল্লতা, সে সুখ আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অর্জন এবং ক্ষতি উভয়ই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই

অতিবাহিত করিবে, ততই সুখ সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্তি কমে কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুম সুবাসিত, স্বচ্ছকল্লোলিনী-শীকরসিক্ত, বসন্তপবন-বিধূত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙ্গিন কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঙ্গিন কাচ। যৌবনে অর্জ্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিত। এখন অর্জ্জিত সুখ অধিক কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী কোথায়? তখন জানিতাম না কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম, এখন জানিয়াছি, এই সংসার-চক্রে আরোহণ করিয়া যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে। যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহৃত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্মলা নদীতে আবর্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে, মনুষ্যহৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিতল সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী।—কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি! উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু তা আর দ্বিতীয়বার শুনিতে চাহি না। উহা যেমন মনুষ্য-কণ্ঠজাত সঙ্গীত, তেমনই সংসারে এক সঙ্গীত আছে, সংসাররসে রসিকরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সঙ্গীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল। সেই সঙ্গীত

আর কি শুনিব না? শুনিব, কিন্তু নানা বাদ্য-ধ্বনিসম্মিলিত, বহুকণ্ঠ প্রসূত সেই পূর্বশ্রুত সংসারগীত আর শুনিব না। সে গায়কেরা আর নাই—সে বয়স নাই, সে আশা নাই, কিন্তু তৎপরিবর্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্যসহায় একমাত্র গীতিধ্বনিতে কর্ণ-বিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীতের সহিত মনুষ্যহৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী

দ্বিতীয় সংখ্যা

মনুষ্য-ফল

আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে, আমার বোধ হয়, মনুষ্য সকল ফলবিশেষ—মায়াবৃন্তে সংসারবৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। সকলগুলি পাকিতে পায় না—কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া যায়, কোনটি পোকায় খায়, কোনটিকে পাখীতে ঠোকরায়, কোনটি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। কোনটি সুপক্ব হইয়া আহরিত হইলে গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণ-ভোজনে লাগে—তাহাদিগেরই ফলজন্ম বা মনুষ্যজনম সার্থক। কোনটি সুপক্ব হইয়া বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িয়া থাকে, শৃগালে খায়। তাহাদিগের মনুষ্যজন্ম বা ফলজন্ম বৃথা। কতকগুলি তিক্ত, কটু বা কষায়,—কিন্তু তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। কতকগুলি বিষময়—যে খায়, সেই মরে। আর কতকগুলি কালজাতীয়—কেবল দেখিতে সুন্দর।

কখন কখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিতে পাই যে পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথকজাতীয় ফল। আমাদের দেশে এক্ষণকার

বড়মানুষদিগকে মনুষ্যজাতি মধ্যে কাঁঠাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি বড় আটা, কতকগুলি কেবল ভুতুড়িসার, গোরুর খাদ্য। কতকগুলি ইঁচোড়ই থাকে, কখনও পাকে না। কতকগুলি পাকিলে পাকিতে পারে, কিন্তু পাকিতে পায় না, পৃথিবীর রাক্ষস-রাক্ষসীরা ইঁচোড়েই পাড়িয়া দালনা রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে। যদি পাকিল ত বড় শৃগালের দৌরাত্ম্য। যদি গাছ ঘেরা থাকে তো ভালই; যদি কাঁঠাল উঁচু ডালে ডালে ফলিয়া থাকে ভালই, নইলে শৃগালরা কাঁঠাল কোনমতে উদরসাৎ করিবে। শৃগালেরা কেহ দেওয়ান, কেহ কারকুন, কেহ নায়েব, কেহ গোমস্তা, কেহ মোসায়েব, কেহ কেবল আশীর্বাদক। যদি এ সকলের হাত এড়াইয়া পাকা কাঁঠাল ঘরে গেল, তবে মাছি ভন ভন করিতে আরম্ভ করিল; মাছিরা কাঁঠাল চায় না, তাহারা কেবল একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন। এ মাছিটি কন্যাভারগ্রস্ত, উহাকে এক ফোঁটা রস দাও—ওটির মাতৃদায়, একটু রস দাও। এটি একখানি পুস্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও—সেটি পেটের দায়ে একখানি সংবাদপত্র বাহির করিয়াছে, উহাকেও একটু দাও। এই মাছিটি কাঁঠালের পিসীর ভাশুরপুত্রের শ্যালার শ্যালীপুত্র—খাইতে পায় না কিছু রস দাও,—সে মাছিটির টোলে টোলে পৌনে চৌদ্দটি ছাত্র পড়ে, কিছু রস দাও। আবার এ দিকে কাঁঠাল ঘরে রাখাও ভাল নয়—পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠে। আমার বিবেচনায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া উত্তম নির্জল দুগ্ধের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া, কমলাকান্তের ন্যায় সুব্রাহ্মণকে ভোজন করানই ভাল।

এ দেশের সিভিল সার্ভিসের সাহেবদিগের আমি মনুষ্য-জাতি মধ্যে আম্রফল মনে করি। এ দেশে আম্র ছিল না, সাগর-পার হইতে কোন মহাত্মা এই উপাদেয় ফল এ দেশে আনিয়াছেন। আম্র দেখিতে রাঙ্গা রাঙ্গা, ঝাঁকা আলো করিয়া বসে। কাঁচায় বড় টক—পাকিলে সুমিষ্ট বটে, কিন্তু তবু হাড়ে টক যায় না। কতকগুলা আম্র এমন কদর্য যে পাকিলেও টক যায় না। কিন্তু দেখিতে বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা হয়, বিক্রেতা ফাঁকি দিয়া পঁচিশ টাকা শ' বিক্রয় করিয়া

যায়। কতকগুলি কাঁচা-মিঠে আছে—পাকিলে পানশে। কতকগুলি জাঁকে পাকা। সেগুলি কুটিয়া নুন মাখিয়া আমসী করাই ভাল।

সকলে আম্র খাইতে জানে না। সদ্য গাছ হইতে পাড়িয়া এ ফল খাইতে নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ সেলাম জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিও—যদি জোটে, তবে সে জলে একটু খোসামোদ বরফ দিও—বড় শীতল হইবে। তারপর ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে পার।

স্ত্রীলোকদিগকে লৌকিক কথায় কলাগাছের সহিত তুলনা করিয়া থাকে। কিন্তু সে গেছো কথা, কদলীফলের সঙ্গে ভুবনমোহিনী জাতির আমি সৌসাদৃশ্য দেখি না! স্ত্রীলোক কি কাঁদি কাঁদি ফলে? যাহার ভাগ্যে ফলে ফলুক কমলাকান্তের ভাগ্যে ত নয়। কদলীর সঙ্গে কামিনীগণের এই পর্যন্ত সাদৃশ্য আছে যে উভয়েই বানরের প্রিয়। কামিনীগণের এ গুণ থাকিলেও কদলীর সঙ্গে তাঁহাদিগের তুলনা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে, কতকগুলি কটুভাষী আছেন, তাঁহারা ফলের মধ্যে মাকাল ফলকেই যুবতীগণের অনুরূপ বলেন। যে বলে, সে দুর্মুখ—আমি ইঁহাদিগের ভৃত্যস্বরূপ; আমি তাহা বলিব না।

আমি বলি, রমণীমণ্ডলী এ সংসারে নারিকেল। নারিকেলও কাঁদি কাঁদি ফলে বটে, কিন্তু (ব্যবসায়ী নহিলে) কেহ কখনও কাঁদি কাঁদি পাড়ে না। কেহ কখন দ্বাদশীর পারণার অনুরোধ অথবা বৈশাখমাসে ব্রাহ্মণসেবার জন্য একটি আধটি পাড়ে। কাঁদি কাঁদি পাড়িয়া খাওয়ার অপরাধে যদি কেহ অপরাধী থাকে, তবে সে কুলীন ব্রাহ্মণেরা। কমলাকান্ত কখনও সে অপরাধী নহে।

বৃক্ষের নারিকেলের ন্যায় সংসারের নারিকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা। করকচি বেলা উভয়েই বড় স্নিগ্ধকর—নারিকেলের জলে উদর স্নিগ্ধ হয়—কিশোরীর অকৃত্রিম বিলাস লক্ষণশূন্য প্রণয়ে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়। কিন্তু দুই জাতীয়,—ফলজাতীয় এবং মনুষ্যজাতীয়—নারিকেলের ডাবই ভাল। তখন দেখিতে যেমন উজ্জ্বল শ্যাম,—কেমন জ্যোতির্ময় রৌদ্র তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে—যেন সে নবীন শ্যামশোভায় জগতের রৌদ্র শীতল হইতেছে। গাছের উপর কাঁদি কাঁদি

নারিকেল, আর গবাক্ষপথে কাঁদি কাঁদি যুবতী, আমার চক্ষে একই দেখায়,—উভয়েই চতুর্দিকে আলো করিয়া থাকে, কিন্তু দেখ,—দেখিয়া ভুলিও না—এই চৈত্র মাসের রৌদ্রে গাছ হইতে পাড়িয়া ডাব কাটিও না—বড় তপ্ত। সংসার-শিক্ষাশূন্য কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না,—তোমার কলিজা পুড়িয়া যাইবে। আম্রের ন্যায় ডাবকে বরফজলে রাখিয়া শীতল করিও, বরফ না জোটে, পুকুরের পাঁকে পুতিয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা করিও—মিষ্ট কথায় না করিতে পার, কমলাকান্ত চক্রবর্তীর আজ্ঞা—কড়া কথায় করিও।

নারিকেলের চারটি সামগ্রী—জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া। নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্নেহের আমি সাদৃশ্য দেখি। উভয়ই বড় স্নিগ্ধকর। যখন তুমি সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন শীতল জল পান করিও—সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার দারিদ্র-চৈত্রে বা বন্ধু বিয়োগ-বৈশাখে, তোমার যৌবন-মধ্যাহ্নে বা রোগতপ্ত বৈকালে আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে? মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখ আছে? গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে?

তবে ঝুনো হইলে ডাবের জল একটু ঝাল হইয়া যায়। রামার মা ঝুনো হইলে পর, রামার বাপ ঝালের চোটে বাড়ী ছাড়িয়াছিল। এই জন্য নারিকেলের মধ্যে ডাবের আদর।

নারিকেল শস্য স্ত্রীলোকের বুদ্ধি। করকচি বেলায় বড় থাকে না; ডাবের অবস্থায় বড় সুমিষ্ট, বড় কোমল; ঝুনোর অবস্থায় বড় কঠিন, দন্তস্ফুট করে কার সাধ্য—তখন ইহাকে গৃহিণীপনা বলে। রসাল গৃহিণী-পনা বটে, কিন্তু দাঁত বসে না। একদিকে কন্যা বসিয়া আছেন, মায়ের অলংকারের বাক্স হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিবেন—কিন্তু ঝুনোর শস্য এমনি কঠিন যে, মেয়ের দাঁত বসিল না—ঝুনো—দয়া করিয়া একটি মাকড়ি বাহির করিয়া দিল। হয়ত পুত্র বসিয়া আছেন, মায়ের নগদ পুঁজির উপর দাঁত বসাইবেন—ঝুনো দয়া করিয়া নগদ সাত সিকা

বাহির করিয়া দিল। স্বামী প্রাচীন বয়সে একটি ব্যবসা ফাঁদিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ বয়সে হাত খালি—টাকা নইলে ব্যবসা হয় না, ঝুনোর উপর দৃষ্টি। দুই চারটি প্রবৃত্তিরূপ দন্ত ফুটাইয়া দিলেন—বুড়া বয়সে দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। শেষে যদি দাঁত বসিল, নারিকেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি ? যতদিন না টাকা ফিরিয়া দেন, ততদিন—অজীর্ণ রোগে নিদ্রা হয় না।

তারপরে মালা—এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা—কখনও আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না, স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় কাজে লাগে না, স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মেরি সমরবিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেনঅষ্টেন বা জর্জ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছিলেন—মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে।

ছোবড়া—স্ত্রীলোকের রূপ। ছোবড়া নারিকেলের বাহ্যিক অংশ। দুই বড় অসার পরিত্যাগ করাই ভাল। তবে ছোবড়ায় একটি কাজ হয়, উত্তম রজ্জু প্রস্তুত হয়, তাহাতে জাহাজ বাঁধা গিয়াছে। তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান, স্ত্রীলোকেরা রূপের কাছিতে কত ভারি ভারি মনোরথ টানে। যখন রথটানা রাবণের আইন হইবে, তখন তাতে এ রথ টানা নিষেধের জন্য যেন একটা ধারা থাকে, তাহা হইলে অনেক নরহত্যা নিবারণ হইবে। আমি জানি না, নারিকেলের রজ্জু গলায় বাঁধিয়া কেহ কখনও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন কি না কিন্তু রমণীর রূপরজ্জু গলায় বাঁধিয়া কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে ?

বৃক্ষের নারিকেল এবং সংসারের নারিকেলের সঙ্গে আমার বিবাদ এই যে, আমি হতভাগ্য দুয়ের এককেও আহরণ করিতে পারিলাম না। অন্য ফল আকর্ষি দিয়া পাড়া যায়, কিন্তু নারিকেল গাছে না উঠিলে পাড়া যায় না। গাছে উঠিতে গেলেও হয় নিজের পায়ে বাঁধিতে হইবে, না হয় ডোমের খোসামোদ করিতে হইবে।

ডোমের খোসামোদ করিতেও রাজী আছি আমি। আমার ভাগ্য-

দোষে কপালে নারিকেলও জোটে না। আমি যেমন মানুষ, তেমনি গাছে, তেমনি রূপগুণের আকর্ষি দিয়া নারিকেল পাড়িতে পারি। কিন্তু ভয়, পাছে নারিকেল ঘাড়ে পড়ে। এমন অনেক শ্যামী, বামী, রামী, কামিনী আছে যে কমলাকান্তকেও স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু পরের মেয়ে ঘাড়ে করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে এ দীন অসমর্থ। অতএব এ যাত্রা কমলাকান্ত ভক্তিভাবে নারিকেল ফলটি বিশ্বেশ্বরকে দিবেন। তিনি একে শ্মশানবাসী, তাহাতে আবার বিষপান করিয়াছেন—ছাই ডাব-নারিকেল তাঁহার কি করিবে?

এ দেশে একজাতীয় লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা দেশ-হিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমূলফুল ভাবি। যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে বড় শোভা—বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু আমার চোখে নেড়া গাছে তত রাঙ্গা ভাল দেখায় না। একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত, পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রাঙ্গা দেখা যায়, সেই সুন্দর, ফুলে গন্ধ-মাত্র নাই—কিন্তু তবু ফুল বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা। যদি ফুল ঘুচিয়া ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছু লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্র-মাস আসিছে, রৌদ্রের তাপে অন্তর্লঘু ফল ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে, তাহার ভিতর খানিক তূলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পড়ে।

অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধুতুরাফুল। বড় বড় লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে তাঁহাদিগের অতি সুদীর্ঘ কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কণ্টকময় ধুতুরা। আমি অনেকদিন হইতে মানস করিয়াছি যে কুক্কুটমাংস ভোজন করিয়া হিন্দুজন্ম পবিত্র করিব। কিন্তু অধম ধুতুরাগুলার কাঁটার জ্বালায় পারিলাম না। গুণের মধ্যে এই যে ধুতুরায় মাদকের মাদকতা বৃদ্ধি করে। যে গাঁজা-খোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার সঙ্গে দুটো ধুতুরার বীচি সাজিয়া দাও—যে সিদ্ধি-খোরের সিদ্ধিতে নেশা হয় না, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে দুটো বীচি বাটিয়া দাও নেশা জমিয়া উঠিবে। বোধ হয়, এই হিসেবেই বঙ্গীয়

লেখকেরা আপন আপন প্রবন্ধ মধ্যে অধ্যাপকদিগের নিকট হইতে দুই চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন। প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন ধুতুরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে। এই নেশায় বঙ্গদেশ আজিকালি মাতিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল বলিয়া গণি। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু দুগ্ধকেই স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলে। গুণের মধ্যে কেবল অম্লগুণ—তার নিকৃষ্ট অম্ল, তবে এক গুণ মানি, ইহারা সাক্ষাৎ কাষ্ঠাবতার। তেঁতুল-কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়ান ভাল, সত্য বলিতে কি তেঁতুলের মত কুসামগ্রী আমি সংসারে দেখিতে পাই না। যে কিয়ৎ পরিমাণে খায় তাহারই অজীর্ণ হয়, সেই অম্ল উদ্গার করে। যে অধিক পরিমাণে খায়, সেই অম্লপিত্তরোগে চিররুগ্ন। যাঁহারা সাহেব হইয়াছেন, টেবিলে বসিয়া গ্যাসের আলোতে বা আর্গাগু জ্বালিয়া ফয়জু খানসামার হাতের পাক, কাঁটা চামচে ধরিয়া খাইতে শিখিয়াছেন তাঁহারা এক দায় এড়াইয়াছেন—তেঁতুলের অম্লর বড় ধার ধারিতে হয় না, আগাগোড়া তেঁতুলের মাছ দিয়া ভাত মারিতে হয় না। কিন্তু যাঁহাদিগের চালা-ঘরে বসিয়া মুঙ্গেরের পাথর কোলে করিয়া পদ্মীপিসীর রান্না খাইতে হয়, তাঁহাদিগের কি যন্ত্রণা! পদ্মীপিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্নান করে, নামাবলী গায়ে দেয়, হাতে তুলসীর মালা কিন্তু রাঁধিবার বেলা কলায়ের ডাল আর তেঁতুলের মাড় ছাড়া আর কিছুই রাঁধিতে জানে না। ফয়জু জাতিতে নেড়ে, কিন্তু রাঁধে অমৃত।

আর একটি মনুষ্যফলের কথা বলা হইলেই অন্ত ক্ষান্ত হই। দেশী হাকিমেরা কোন্ ফল বল দেখি? যিনি রাগ করেন করুন, আমি স্পষ্ট কথা বলিব, ইহারা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবে ইহারা উচুতে ফলিলেন, নইলে মাটিতে গড়াগড়ি যান। যেখানে ইচ্ছা সেইখানে তুলিয়া দাও, একটু ঝড়বাতাসেই লতা ছিঁড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি। অনেকগুলি রূপে কুষ্মাণ্ড, গুণেও কুষ্মাণ্ড। তবে কুষ্মাণ্ড

এখন দুই প্রকার হইতেছে—দেশী কুমড়া ও বিলাতী কুমড়া। বিলাতী কুমড়া বলিলে এমত বুঝায় না যে, এই কুমড়াগুলি বিলাত হইতে আসিয়াছে। যেমন দেশী মুচির তৈয়ারী জুতাকে ইংরেজী জুতা বলে, ইহারাও সেইরূপ বিলাতী। বিলাতী কুমড়ার যে গৌরব অধিক ইহা বলা বাহুল্য। সংসারোদ্যানে আরও অনেক ফল ফলে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অকর্মণ্য কদর্য টক—

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী

তৃতীয় সংখ্যা

ইউটিলিটি* বা উদরদর্শন

বেন্থাম্ হিতবাদ-দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আমি এই হিতবাদ-মতে অমত করি না, বরং আমি ইহার অনুমোদক, তবে আপনারা জানেন কি না বলিতে পারি না, আমি একজন সুযোগ্য দার্শনিক। আমি এই হিতবাদ-দর্শন অবলম্বন করিয়া, কিছু গড়িয়া একটি নূতন দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে তাহা বাঙ্গালায় প্রচলিত হিতবাদ দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা-মাত্র। তাহার স্থূল মর্ম আমি সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রাচীন প্রথানুসারে দর্শনটি সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে এবং আমি স্বয়ংই সূত্রের ভাষ্য করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছি। বাঙ্গালাতেই সূত্রগুলি লিখিত হইয়াছে, আমি যে অসংস্কৃতজ্ঞ, এমত কেহ মনে করিবেন না। তবে সংস্কৃতে সূত্রগুলি কয়জন বুঝিতে পারিবে। অতএব সাধারণ পাঠকের প্রতি অনুকূল হইয়া বাঙ্গালাতেই সমস্ত কার্য নির্বাহ করিয়াছি। সেই সূত্রগ্রন্থের সারাংশ এই ঃ—

১। জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বরবিশেষকে উদর বলে।

ভাষ্য ॥ বৃহৎ—অর্থাৎ নাসিকা-কর্ণাদি ক্ষুদ্র গহ্বরকে উদর বলা যায় না। বলিলে বিশেষ প্রত্যবায় আছে।

জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বর—জীবশরীরস্থ বলিবার তাৎপর্য এই যে,

নহিলে পর্বত গুহা প্রভৃতিকে উদর বলিয়া পরিচয় দিয়া কেহ তাহার পূর্তির প্রত্যাশা করিতে পারেন। গহ্বর—যদিও জীবশরীরস্থ গহ্বর-বিশেষই উদর শব্দে বাচ্য, তথাপি অবস্থাবিশেষে অঞ্জলি প্রভৃতিও উদরমধ্যে গণ্য। কোন স্থানে উদর পুরাইতে হয়, কোন স্থানে অঞ্জলি পুরাইতে হয়।

২। উদরের ত্রিবিধ পূর্তিই পরমপুরুষার্থ।

ভাষ্য ॥ সাংখ্যেরও এই মত। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ উদরপূর্তি।

আধিভৌতিক—অন্নব্যঞ্জন, সন্দেশ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভৌতিক সামগ্রীর দ্বারা উদরের যে পূর্তি হয়, তাহাই আধিভৌতিক পূর্তি।

আধ্যাত্মিক—যাঁহারা বড়লোকের বাক্যে লুব্ধ হইয়া কালযাপন করেন, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উদরপূর্তি হয়। আধিদৈবিক—দৈবানুকম্পায় প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতির দ্বারা যাঁহাদের উদর পুরিয়া উঠে, তাঁহাদিগকে বলে আধিদৈবিক উদরপূর্তি।

৩। এতন্মধ্যে আধিভৌতিক পূর্তিই বিহিত।

ভাষ্য ॥ বিহিত—বিহিত শব্দের দ্বারা অন্যান্য পূর্তির প্রতিষেধ হইল কি না, ভবিষ্যৎ ভাষ্যকারেরা মীমাংসা করিবেন। এক্ষণে সিদ্ধ হইল, উদর নামক মহাগহ্বরে লুচি-সন্দেশ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের প্রবেশেই পুরুষার্থ। অতএব এ গর্তের মধ্যে কি প্রকার ভূত প্রবেশ করান যাইতে পারে, তাহা নির্বাচন করা যাইতেছে।

৪। বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম, উপাসনা, বল এবং প্রতারণা, এই ষড়বিধি পুরুষার্থের উপায় পূর্ব-পণ্ডিতেরা নির্দেশ করিয়াছেন।

ভাষ্য ॥ (১) বিদ্যা—বিদ্যা কি তাহা অবধারণ করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থ লিখিতে, সংবাদপত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল। কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করেন যে, যে লিখিতে জানে না, সে পত্রাদিতে লিখিবে কি প্রকারে? আমার বিবেচনায় এরূপ তর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কুম্ভীর-শাবক ডিম্ব ভেদ করিবামাত্র জলে গিয়া থাকে, শিখিতে

হয় না। সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গলার স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখাপড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।

(২) বুদ্ধি—যে আশ্চর্য শক্তি দ্বারা তূলাকে লৌহ, লৌহকে তূলা বিবেচনা হয়, সেই শক্তিকেই বুদ্ধি বলে। কৃপণের সহিত ধনরাশির ন্যায় ইহা আমরা স্বয়ং সর্বদা দেখিতে পাই, কিন্তু পরে কখন দেখিতে পায় না। পৃথিবীর সকল সামগ্রীর অপেক্ষা বোধহয় জগতে ইহারই আধিক্য, কেন না, কখন কেহ বলিল না যে, ইহা আমি অল্প পরিমাণে পাইয়াছি।

(৩) পরিশ্রম—উপযুক্ত সময়ে ঈষদুষ্ণ অন্ন-ব্যঞ্জন-ভোজন, তৎপরে নিদ্রা, বায়ুসেবন, তামাকুর ধূমপান, গৃহিণীর সহিত সম্ভাষণ ইত্যাদি গুরুতর কার্য সম্পাদনের নাম পরিশ্রম।

(৪) উপাসনা—কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে হয় তাহার গুণানুবাদ, নয় দোষকীর্তন করিতে হয়। কোন ক্ষমতশালী প্রদান ব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ কথা হইলে, যদি তিনি প্রকৃত দোষমুক্ত ব্যক্তি হয়েন, তবে তাঁহার দোষকীর্তন করাকে নিন্দা বলে। আর যদি তিনি দোষমুক্ত না হয়েন, তবে তাঁহার দোষকীর্তনকে স্পষ্টবক্তৃত্ব বা রসিকতা বলে। গুণপক্ষে তিনি যদি গুণহীন হয়েন, তবে তাঁহার গুণকীর্তনকে ন্যায়নিষ্ঠতা বলে। আর যদি তিনি যথার্থ গুণবান হয়েন, তবে তাঁহার গুণকীর্তনকে উপাসনা বলে।

(৫) বল—দীর্ঘচ্ছন্দ বাক্য—মুখ-চক্ষুর আরক্তভাব—ঘোরতর ডাক হাঁক—মুখ হইতে অনর্গল হিন্দি, ইংরেজী এবং নিষ্ঠীবনের বৃষ্টি—দূর হইতে ভঙ্গী দ্বারা কিল, চড়, ঘুষা এবং লাথি-প্রদর্শনও সার্ধি তিপ্পন্ন প্রকার অন্যান্য অঙ্গভঙ্গী—এবং বিপক্ষের কোন প্রকার উদ্যত দেখিলে অকালে পলায়ন ইত্যাদিকে বল বলে!

বল ষড়বিধ, যথা—

মৌখিক—অভিসম্পাত, গালি, নিন্দা প্রভৃতি।

হাস্ত—কিল, চড়-প্রদর্শনী প্রভৃতি। পাদ—পলায়নাদি। চাক্ষুষ—রোদনাদি। যথা চাণক্যপণ্ডিত বালানাং রোদনং বলং ইত্যাদি।

ঘাচ প্রহার-সহিষ্ণুতা ইত্যাদি। মানস—দ্বেষ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি।

(৬) প্রতারণা—নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পৃথিবীমধ্যে প্রতারক বলিয়া জানিও। এক, পণ্যজীবি। প্রমাণ দোকানদার জিনিস বেচিয়া আবার মূল্য চাহিতে থাকে। মূল্যদাতা-মাত্রেরই মত যে, তিনি ক্রয়কালীন প্রতারিত হইয়াছেন। দ্বিতীয়, চিকিৎসক। প্রমাণ—রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইলে, পরে যদি চিকিৎসক বেতন চায় তবে রোগী প্রায় সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, আমি নিজে আরাম হইয়াছিল, এ বেটা অনর্থক ফাঁকি দিয়া টাকা লইতেছে। তৃতীয়, ধর্মোপদেষ্টা এবং ধার্মিক ব্যক্তি। ইহারা চিরপ্রথিত প্রতারক, ইহাদের নাম ভণ্ড। ইহারা যে প্রতারক, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, ইহারা অর্থাদির কামনা করেন না। ইত্যাদি।

৫। এই ষড় বিধ উপায়ের দ্বারা উদর পূর্তি বা পুরুষার্থ অসাধ্য।

ভাষ্য॥ এই সুত্রের দ্বারা পূর্বপণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করা বিদ্যাদি ষড়বিধ উপায়ের দ্বারা যেখানে উদরপূর্তি হইতে পারে না, ক্রমে তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। "বিদ্যা"—বিদ্যাতে যদি উদর-পূর্তি হইত, তবে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের অন্নভাব কেন? "পরিশ্রম"—পরিশ্রমে যদি হইত, তবে বাঙ্গালী বাবুরা কেরানী কেন? "উপাসনা"—উপাসনায় যদি হইত, তবে সাহেবগণ কমলাকান্তকে অনুগ্রহ করেন না কেন? আমি ত মন্দ পে-বিল লিখি নাই। "বল"—বলে যদি হইত তবে আমরা পড়িয়া মার খাই কেন? "প্রতারণা"—প্রতারণায় যদি হইত, মদের দোকান সময় সময় ফেল হয় কেন?

৬। উদরপূর্তি বা পুরুষার্থ কেবল হিত সাধনের দ্বারা সাধ্য।

ভাষ্য॥ উদাহরণ। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা লোকের কানে মন্ত্র দিয়া তাহাদের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় জাতিগণ অনেক বন্যজাতীর হিতসাধন করিয়াছেন এবং রুসেরা এক্ষণে মধ্য-এশিয়ার হিতসাধনে নিযুক্ত আছেন। বিচারকগণ বিচার করিয়া দেশের হিতসাধন করিতেছেন। অনেকে সুবিক্রেয় এবং অবিক্রেয় পুস্তক

ও পত্রাদি প্রণয়ণ দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতেছেন। সকলের প্রচুর পরিমাণে উদরপূর্তি অর্থাৎ পুরুষার্থ লাভ হইয়াছে।

৭। অতএব সকলে দেশের হিতসাধন করে।

ভাষ্য ॥ এই শেষ সূত্রের দ্বারা হিতবাদ-দর্শন এবং উদার-দর্শনের একতা প্রতিপাদিত হইল। ভরসা করি, ইহা ভারতবর্ষের সপ্তম দর্শন-শাস্ত্র বলিয়া আদৃত হইবে।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী

চতুর্থ সংখ্যা

পতঙ্গ

বাবুর বৈঠকখানায় সেজ জ্বলিতেছে—পাশে আমি মোসায়েবি-ধরনে বসিয়া আছি। বাবু দলাদলির গল্প করিতেছেন—আমি আফিম চাড়াইয়াছি। ঝিমাইতেছি। দলাদলীতে চটিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিয়াছি। বিধিলিপি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি ক্রিয়া পরম্পরায় একটি ফল এই যে, উনবিংশ শতাব্দীর কমলাকান্ত চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য রাত্রে নসীরামবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং আমার সাধ্য কি যে, তাহার অন্যথা করি।

ঝিমাইতে-ঝিমাইতে দেখিলাম যে, একটা পতঙ্গ আসিয়া মানুষের চারিপাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। "চোঁ -ও-ও-ও" "বোঁ-ও-ও-ও" করিয়া শব্দ করিতেছে। আফিমের ঝোঁকে মনে করিলাম পতঙ্গের ভাষা কি বুঝতে পারি না। কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিলাম, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে পতঙ্গকে বলিলাম, "তুমি কি ও চোঁ বোঁ করিয়া বলিতেছ আমি কিছু বুঝিতেছি না।" তখন হঠাৎ আফিম-প্রসাদাৎ দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইলাম। শুনিলাম পতঙ্গ বলিল, "আমি আলোর সঙ্গে কথা কহিতেছি"—তুমি চুপ কর। আমি তখন চুপ করিয়া পতঙ্গের কথা শুনিতে লাগিলাম। পতঙ্গ বলিতেছে—

"দেখ, আলো মহাশয়, তুমি সেকালে ভাল ছিলে,—পিতলের পিলসুজের উপর মেটে প্রদীপে শোভা পাইতে—আমরা স্বচ্ছন্দে পুড়িয়া মরিতাম। এখন আবার সেজের ভিতর ঢুকিয়াছ—আমরা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াব, প্রবেশ করিবার পথ পাই না। পুড়িয়া মরিতে পাই না।

দেখ, পুড়িয়া মরিতে আমাদের রাইট আছে, আমাদের চির-কালের হক। আমরা পতঙ্গজাতি পূর্বাপর আলোতে পুড়িয়া মরিয়া আসিতেছি—কখন কোন আলো বারণ করে নাই। তুমি কাচমুড়ি দিয়া আছ কেন প্রভু? আমরা গরীব পতঙ্গ—আমাদের উপর সহমরণ নিষেধের আইন জারি কেন? আমরা কি হিন্দুর মেয়ে যে পুড়িয়া মরিতে পাইব না?

দেখ, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। হিন্দুর মেয়ের আশা-ভরসা থাকিতে কখন পুড়িয়া মরিতে চাহে না, আগে বিধবা হয়, তবে পুড়িয়া মরিতে বসে। আমরাই কেবল সকল সময় আত্ম-বিসর্জনে ইচ্ছুক। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীজাতিও তুলনা।

আমাদিগের ন্যায় স্ত্রীজাতীও রূপের শিখা জ্বলিতে দেখিতে ঝাঁপ দিয়া পড়ে বটে। ফলও এক, আমরাও পুড়িয়া মরি, তাহারাও পুড়িয়া মরে। কিন্তু দেখ, সেই দাহতেই তাহার সুখ, আমাদের কি সুখ? আমরা কেবল পুড়িবার জন্য পুড়ি, মরিবার জন্য মরি। স্ত্রীজাতিতে পারে? তবে আমাদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা কেন?

দেখ, আমার ভিক্ষাটি বড় ছোট—আমার প্রাণ তোমাকে দিয়া যাইব, লইবে না? দিব বৈ ত গ্রহণ করিব না; তবে ক্ষতি কি? তুমি রূপ পোড়াইতে জন্মিয়াছ; আইস, যার যে কাজ করিয়া যাই। তুমি হাসিতে থাক—আমি পুড়ি।

তুমি বিশ্বধ্বংসক্ষম—তোমাকে বোধিতে পারে জগতে এমন কিছুই নাই—তুমি কাচের ভিতর লুকাইয়া আছ কেন? তুমি জগতের গতির কারণ—কার ভয়ে তুমি ডোমের ভিতরে লুকাইয়াছ? কোন্ ডোমে এ ডোম গড়িয়াছ? কোন্ ডোমে তোমাকে এ ডোমের

ভিতরে পুরিয়াছ? তুমি সে বিশ্বব্যাপী কাচ ভাঙ্গিয়া আমায় দেখা দিতে পারনা?

তুমি কি? তা আমি জানি না, আমি জানি না—কেবল জানি যে, তুমি আমার বাসনার বস্তু, আমার জাগ্রতের ধ্যান, নিদ্রার স্বপ্ন, জীবনের আশা—মরণের আশ্রয়। তোমাকে কখন জানিতে পারিব না, জানিতে চাহিও না—যেদিন জানিব সেইদিন আমার সুখ শেষ হইবে। কাম্য বস্তুর স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে?

তোমাকে কি পাইব না? কতদিন তুমি কাচের ভিতর থাকিবে? আমি কাচ ভাঙ্গিতে পারিব না? ভাল, থাক—আমি ছাড়িব না—আবার আসিতেছি। "বোঁ-ও-ও-ও"

পতঙ্গ উড়িয়া গেল। মনুষ্যমাত্রই পতঙ্গ, সকলের একটি বহ্নি আছে, সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে। সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে! জ্ঞানবহ্নি, ধনবহ্নি, মানবহ্নি, রূপবহ্নি, ধর্মবহ্নি, ইন্দ্রিয়বহ্নি—সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাচ; যে আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই—কই, তাহা ত পাই না—আবার ফিরিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে সংসার এতদিন পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম মানসপ্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয়জন বাঁচিত? অনেকে জ্ঞানবহ্নির আবরণ-কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়; সক্রেটিস, গ্যালিলিও তাহাদের পুড়িয়া মরিল। অনেক রূপবহ্নি, ধর্মবহ্নি, মানবহ্নিতে পুড়িয়া মরিতেছে, আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয় তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মানবহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন, জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহ্নিজাত দাহেরগীত "Paradise Lost" ধর্মবহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেণ্টপল। ভোগবহ্নির পতঙ্গ "আণ্টনি, ক্লিওপেত্রা। রূপবহ্নির "রোমিও জুলিয়েট" ঈর্ষাবহ্নির

"ওথেলো," গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহবহ্নিতে সীতাপতঙ্গে দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি। বহ্নি কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, ক্রিয়া, গতি এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে, ধর্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক অপরিজ্ঞান পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?

দেখ ভাই পতঙ্গের দল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন ফল নাই। পার আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া মর। না পার, চল, বোঁ করিয়া চলিয়া যাই।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

সপ্তম সংখ্যা

বসন্তের কোকিল

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখস্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। তুমি বসন্তের কোকিল, শীত-বর্ষার কেহ নও।

রাগ করিও না—তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন, যখন নসীবাবুর তালুকের খাজনা আসে তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়—কত টিকি, কোঁটা, তেড়ি, চশমার হাট লাগিয়া যায়—কত কবিতা, শ্লোক, গীত, হেটো ইংরাজী, মেঠো ইংরাজী, ছেঁড়া ইংরাজীতে নসীবাবুর বৈঠকখানা পারাবত-কাকলিসঙ্কুল গৃহসৌধবৎ বিকৃত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাড়ীতে নাচ গান, যাত্রা, পর্ব উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে মানুষ-কোকিল আসিয়া তাঁহার ঘরবাড়ী আঁধার করিয়া তুলে—কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাঁদে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নিচে গড়ায়। যখন নসীবাবু বাগানে যান, তখন মানুষ কোকিল তাঁহার সঙ্গে পিঁপীড়ার সারি

দেয়। আর যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নসীবাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও অসুখ, এ জন্য আসিতে পারিলেন না; কাহার বড় সুখ—একটি নাতি হইয়াছে, এ জন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না, কেহ সমস্ত রাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এ জন্য আসিতে পারিলেন না। আসল কথা—সেদিন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল সেদিন আসিবে কেন?

তা ভাই বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক ঐ অশোকের ডালে বসিয়া, রাঙ্গা ফুলের রাশির মধ্যে কাল শরীর, জলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মত লুকাইয়া রাখিয়া একবার তোমার ঐ পঞ্চমস্বরে কু—উ বলিয়া ডাক। তোমার ঐ কু—উ রবটি আমি বড় ভালবাসি। তুমি নিজে কালো—পরান্ন প্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলেই "কু", তবে যত পার ঐ পঞ্চমস্বরে ডাকিয়া বল "কু-উ"। ঐটি তোমার জিত—পঞ্চস্বর। নইলে তোমার ও কু, কেহ শুনিত না। এ পৃথিবীতে গ্লাডষ্টোন, ডিস্রেলি প্রভৃতির ন্যায়—তুমি কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে নইলে অত কালো চলিত না; তোমার চেয়ে হাঁড়িচাচা ভাল। গলাবাজির এত গুণ না থাকিলে যিনি বাজে নভেল লিখিয়াছেন, তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন? আর জন ষ্টুয়ার্ট মিল পার্লিয়ামেণ্টে স্থান পাইলেন না কেন?

তবে কোকিল, তুমি প্রকৃতির পার্লিয়ামেণ্টে দাঁড়াইয়া নক্ষত্রময় নীলচন্দ্রাতপমণ্ডিত, গিরিনদীনগরকুঞ্জাদিবেঞ্চ সুসজ্জিত, এ মহানভাগৃহে তোমার এ মধুর পঞ্চমস্বরে—কু—উ বলিয়া ডাক—সিংহাসন হইতে হেষ্টিংস পর্যন্ত সকলেই কাঁপিয়া উঠুক। "কু—উ!" ভাল, তাই ও কলকণ্ঠে কু বলিলে কু মানিব, সু বলিলে সু মানিব। কু বৈকি সব কু। লতায় কণ্টক আছে; কুসুমে কীট আছে, গন্ধে বিষ আছে, পত্র শুষ্ক হয়, বিকৃত হয়, স্ত্রীজাতি বঞ্চনা জানে। কু—উ বটে

—তুমি গাও। কিন্তু তুমি ঐ পঞ্চমস্বরে বলিলেই কু মানিব—নচেৎ কুঁকড়ো বাবাজি "কু কু কু কু" বলিয়া আমার সুখের প্রভাত-নিদ্রাকে কু বলিলে আমি মানিব না। তার গলা নাই। গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চেঁচালেই হয় না; যদি শব্দে-মন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে। বেপরদা বা কড়ি-মাধ্যমে কাজ নয়।

তবে তোমার স্বরকে পঞ্চম-স্বর কেন বলে তাহা বুঝি না। যাহা মিষ্ট—তাহাই পঞ্চম। দুইটি পঞ্চম মিষ্ট বটে--সুরের প্রপঞ্চম আর আলতা-পরা ছোট পায়ের গুজরী পঞ্চম। তবে সুখ পঞ্চমে উঠিলেই মিষ্ট, ছোট পায়ের পঞ্চম পা হইতে নামাইলেই মিষ্ট।

কোন স্বর পঞ্চম, কোন স্বর সপ্তম, কে মধ্যম, কে গান্ধার, আমাকে কে বুঝাইয়া দিবে? এটি হাতীর ডাক, ওটি ঘোড়ার ডাক, সেটি ময়ুরের কেকা, ওটি বানরের কিচিমিচি, এ বলিলে ত কিছু বুঝিতে পারি না। আমি আফিংখোর, বেসুরো শুনি, বেসুরো বুঝি, বেসুরো লিখি, ধৈবত, গান্ধার, নিষাদ, পঞ্চমের কি ধার ধারি? যদি কেহ পাখোয়াজ, তানপুরা, দাড়ি দাঁত লইয়া আমাকে সপ্তসুর বুঝাইতে আসে, তবে তাহার গর্জন মঙ্গলা গাইয়ের সদ্যঃপ্রসূত বৎসের ধ্বনি আমার মনে পড়ে তাহার পীতাবশিষ্ট নির্জল দুগ্ধের অনুধানে মন ব্যস্ত হয়,—সুর বুঝা হয় না। আমি গায়কের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্য আশীর্বাদ করি, যেন তিনি জন্মান্তরে মঙ্গলার বৎস হন।

এখন আয় পাখি। তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই। তুইও যে, আমিও সে—সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। তুই এই পুষ্পকাননে বৃক্ষে আপনার আনন্দে গাহিয়া বেড়াস—আমিও এই সংসার-কাননে গৃহে গৃহে আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া বেড়াই। আয় ভাই, তোতে আমাতে মিলে মিশে পঞ্চম গাই। তোরও কেহ নাই—আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই—আনন্দ আছে। তোর পুঁজিপাটা ঐ গলা, আমার পুঁজিপাটা এই আফিমের

ডেলা ; তুই এ সংসারে পঞ্চম স্বর ভালবাসিস—আমিও তাই, তুই পঞ্চমস্বরে কারে ডাকিস ? আমিও বা কারে? বল দেখি পাখি, কারে ?

যে সুন্দর, তাকেই ডাকি ; যে ভাল, তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে তাকেই ডাকি। এই যে আশ্চর্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত, সুন্দর জগৎ শরীর যিনি আত্মা, তাহাকেই ডাকি। আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস। জানিয়া ডাকি, না জানিয়া ডাকি সমান কথা ; তুইও কিছু জানিস না, আমিও কিছু জানি না, তোরও ডাক পৌঁছিবে, আমারও ডাক পৌঁছিবে। যদি সর্ব-শব্দগ্রাহী কোন কর্ণ থাকে তবে তোর ডাক পৌঁছিবে না কেন ? আয় ভাই, একবার মিলে মিশে দুই জনে পঞ্চস্বরে ডাকি।

তবে কুহুরবে সাধা গলায় কোকিল একবার ডাক দেখি রে! কণ্ঠ নাই আমার মনের কথা কখনও বলিতে পারিলাম না। যদি তোর এ ভুবন-ভুলান স্বর পাইতাম ত বলিতাম। তুই আমার সেই মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া এই পুষ্পময় কুঞ্জবনে একবার ডাক দেখিরে! কি কথাটি বলিব মনে করি, বলিতে জানি না, সেই কথাটি তুই বল দেখিরে! কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে বলা হইল না,—যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই, অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি। ঐ নীলাম্বর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে উড়িয়া কখন কি "কুহু" বলিয়া ডাকিতে পাইব না ? আমি না পাই, তুই কোকিল, আমার হয়ে একবার ডাক দেখি রে।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী

অষ্টম সংখ্যা

স্ত্রীলোকের রূপ

অনেক ভামিনী রূপের গৌরবে মাটিতে পা দেন না। ভাবেন, যে দিক দিয়ে অঙ্গ দোলাইয়া চলিয়া যান, লাবণ্যের তরঙ্গে সে দিকের সংজ্ঞা ডুবিয়া যায়। নূতন জগতের সৃষ্টি হয়। তাহারা মনে

করেন, তাঁহাদের রূপের ঝড় যে দিকে হয়, সে দিকে সকলের ধৈর্য-চালা উড়িয়া যায় ধর্মকোটে ভাঙিয়া পড়ে; যখন পুরুষের মন চূড়ায় তাঁহাদের রূপের বান ডাকে, তখন তাঁহাদের কর্ম-জাহাজ, ধর্ম-পান্সী বুদ্ধির-ডিঙি সব ভাসিয়া যায়। কেবল সৌন্দর্যা-ভিমানিনীকুলের এইরূপ প্রতীতি নহে; পুরুষেরাও যখন মোহিনীশক্তির বশীভূত হইয়া তাঁহাদিগের রূপের মহিমা বর্ণনারম্ভ করেন, তখন যে তাঁহারাও কি বলেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন গগনের জ্যোতিষ্ক, পৃথিবীর পর্বত, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, লতা-গুল্মাদি সকলই লইয়া উপমার জন্য টানাটানি পাড়ান—আবার অনেকেই অপমানিত করিয়া পাঠান। রূপসীর মুখমণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহারা পূর্ণশশীকে নিমন্ত্রণ করিয়া, আবার মসীবৎ ম্লান বলিয়া ফেরত পাঠান। গরীব চাঁদ আপনার কলঙ্ক আপনি বুকে করিয়া রাতারাতি আকাশের কাজ সারিয়া পলায়ন করে। সুন্দরীর ললাটে সিন্দুর-বিন্দু দেখিয়া তাঁহার উষার সীমন্ত-শোভা তরুণ তপনের নিন্দা করেন; রাগে সূর্যদেব পৃথিবী দগ্ধ করিয়া চলিয়া যান। রসময়ীর আস্যের হাস্যরাসি অবলোকন করিয়া প্রফুল্ল-কমলে সৌররশ্মির লাস্য বা বিকশিত কুমুদে কৌমুদীর নৃত্য তাঁহারা আর ভালবাসেন না। সে অবধি কমল-কুমুদে কীট-পতঙ্গের অধিকার। কামিনীর কণ্ঠহার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার তারকামালার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। বোধ করি ভবিষ্যতের জ্যোতিষের অনুশীলন ত্যাগ করিয়া তাঁহারা স্বর্ণকারের বিদ্যায় মন দিবেন। রঙ্গিণীর শরীর-সঞ্চালনে তাঁহার এত লাবণ্য লীলা বিলোকন করেন যে, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মন্দ মন্দ আলোকিত বৃক্ষপত্রে বা নিয়ত কম্পিত সিন্ধু হিল্লোলে চন্দ্রিকার খেলায় তাঁহাদিগের মন আর উঠে না। এইজন্যই বা রাতে নিদ্রা যান এবং নদীকে কলসী কলসী করিয়া শুষিতে থাকেন। আবার যখন রমণীর নয়ন বর্ণনা করেন, তখন সরোবরের মলয়-মারুতে দোদুল্যমান নীলোৎপল দূরে থাকুক, বিশ্বমণ্ডলের কিছুই তাঁহাদের ভাল লাগে না।

এই নারীমূর্তির স্তাবককুলে উপমানুভবশক্তির কিছু করিতে হয়।' তাহাদিগের এক চক্ষু কল্পনা-প্রভাবে কখন পক্ষী, যথা খঞ্জন, 'চকোর' কখনও মৎস্য, যথা সফরী। কখনও উদ্ভিদ, যথা পদ্ম, পলাশ, ইন্দিবর। কখনও জড়পদার্থ যথা আকাশের তারা। এই চন্দ্র কখনও রমণীর মুখমণ্ডল, কখনও তাহার পায়ের নখর। উচ্চ কৈলাসশিখর এবং ক্ষুদ্র কমল কোরক একেরই উপমাস্থল, কিন্তু ইহাতেও কুলায় না বলিয়া দাড়িম্ব, কদম্ব, করিকুম্ভ এই বিষয় উপমাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে। জলচর ক্ষুদ্র পক্ষী হংস এবং স্থলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ হস্তী, ইহাদিগের গমনে বৈষম্য থাকাই স্বাভাবিক উপলব্ধি, কিন্তু কবিদিগের চক্ষে উভয়েই রমণীকুলচরণবিন্যাসের অনুকারী। আবার যে সে হাতীর গমনের সহিত এই হংসগামীনের গমনসাদৃশ্য নির্দেশ করা বিধেয় নহে।

যে হাতী হাতীর রাজা, সেই হাতীর সঙ্গেই গজেন্দ্রগামিনীর গতি তুলনীয়। শুনিয়াছি হাতী একদিনে অনেক দূর যাইতে পারে, অশ্বাদি কোন পশু তত পারে না। যাঁহাদিগকে দূর যাইতে হয়, তাঁহারা এই গজেন্দ্রগামিনীদিগের পিঠে চড়িয়া যান না কেন? যে দিকে রেইলওয়ে নাই, সেদিকে বাছিয়া গজগামিনীর মেয়ের ডাক বসাইলে কেমন হয়?

আমিও এককালে কামিনীভক্ত কবিদলভুক্ত ছিলাম! কিন্তু এক্ষণে আর আমার সে ভাব নাই। আমার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে। আমি মানময়ী মানবী-মণ্ডলের কুহকাজল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া পলায়ন করিয়াছি। জালিয়ার পচা জালে রাঘব বোয়াল পড়িলে যেমন জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি, ক্ষুদ্র মাকড়সার জালে যেমন গুবরে পোকা পড়িলে জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে আমি তেমনিই পলায়ন করিয়াছি। দুরন্ত গোরু একবার দড়ি ছিঁড়িতে পারিলে যেমন ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে, আমি তেমনি দৌড় মারিয়া পলায়ণ করিয়াছি। সকলই আফিমের প্রাসাদে। হে মাতঃ আফিম দেবী! তোমার কৌটা অক্ষয় হউক! আমি তোমার কৃপায় সাধারণের উপকারার্থে নিজের মন খুলিয়া দুই চারটি কথা বলিব।

কথা শুনিয়া কেবল স্ত্রীলোক কেন, অনেক পুরুষেও আমাকে পাগল বলিবেন। বলুন, ক্ষতি নাই। নূতন কথা যে বলে, সেই পাগল বলিয়া গণ্য হয়। গ্যালিলিও বলিলেন, পৃথিবী ঘুরিতেছে, ইতালীর ভদ্রসমাজ, ধার্মিকসমাজ, বিদ্যাসমাজ শুনিয়া হাসিলেন। শুনিয়া স্থির করিলেন, গ্যালিলিওর মতিভ্রম হইয়াছে। কালের স্রোতে বহিয়া গেল। ইতালীর ভদ্রসমাজ, ধার্মিকসমাজ, বিদ্যাসমাজ আর পৃথিবী ঘুরিতেছে শুনিলেন হাসেন না। গ্যালিলিওকে আর মতিভ্রান্ত জ্ঞান করেন না।

সকলে সৌন্দর্যবিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য স্বীকার করেন। বলিতে কি তোমাদের নিন্দা করিতে ভয় করে। পথ বুঝিয়া যদি তোমরা নথ-ফাঁদ পাতিয়া রাখ তবে কত হস্তী বদ্ধচরণ হইয়া, তোমাদের নাকে ঝুলিতে পারে—কলমকান্ত কোন্ ছার। তোমাদের নথের নোলক খসিয়া পড়িলে মানুষ খুন হইবার অনেক সম্ভাবনা, চন্দ্রহারের একখানি চাঁদ যদি স্থানচ্যুত হইয়া কাহারও গায়ে লাগে তবে তাহার হাত-পা ভাঙ্গা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা রাগ করিও না। আর হে রমণীপ্রিয়, কল্পনাপ্রিয়, উপমাপ্রিয় কবিগণ, তোমাদিগের স্ত্রীদেবীর সুখময়ী সুবর্ণময়ী প্রতিমা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তোমরা আমাকে মারিতে উদ্যত হইও না। আমি সপ্রমাণ করিয়া দিব যে, তোমরা কুসংস্কারাবিষ্ট পৌত্তলিক। তোমরা উপাস্য দেবতার প্রকৃত মূর্তি পরিত্যাগ-পূর্বক বিকৃত প্রতিমূর্তির পূজা করিতেছ।

যাহার সুন্দর কেশপাশ আছে, সে আর পরচুলা ব্যবহার করে না! যাহার উজ্জ্বল ভাল দাঁত আছে, তাহার কৃত্রিম দন্তের প্রয়োজন হয় না। যাহার বর্ণে লোকের মন হরণ করে, তাহার আর রং মাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে হয় না। এইরূপে যাহার যে বস্তু আছে, সে তাহার জন্য লালায়িত হয় না। সে বুঝিতে পারে যে, প্রকৃতি কোন পদার্থে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই তদ্বিষয়ে আপনার অভাব-মোচনার্থ যত্ন করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি

স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সৌন্দর্যের অত্যন্ত অভাব। স্বীয় দেহ সজ্জিত করিতে এত যাহাদিগের যত্ন, তাহাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য যে অধিক আছে, এরূপ বোধ হয় না যাহার নাক সুন্দর নহে, সেই নাকে নথরূপ রজ্জুতে নোলক-জগন্নাথকে দোলায়। যাহার কান সুন্দর নহে, সেই ঢাকাইকানরূপ নানা ফলফুল পশুপক্ষী-বিশিষ্ট বাগানের ঘোড়া কানে লাগাইয়া নেয়। যাহার হৃদয় ভাল নহে, সেই সেখানে সাতনরকাঁসির দড়ি টাঙ্গাইয়া পুরুষজাতির বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী বালকদিগের ভীতিবিধান করে। যে অলঙ্কার বিনা আপনাকে সুন্দরী বলিয়া জানে, সে কখনও অলঙ্কারের বোঝা বইতে এত ব্যগ্র হয় না। পুরুষে ভূষণ বিনা সন্তুষ্ট থাকে, স্ত্রীলোক ভূষণ বিনা মনুষ্য-সমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়। অতএব স্ত্রীলোকদিগের নিজের ব্যবহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি সৌন্দর্য-বিষয়ে নিকৃষ্ট।

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা যে পুরুষজাতির সৌন্দর্য অধিক প্রকৃতির সৃষ্টিপদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে, আরও স্পষ্ট প্রতীত হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রকলাপ ময়ুরের আছে, ময়ূরীর তাহা নাই। যে কেশরে সিংহের এক শোভা, তাহা সিংহীর নাই। যে ঝঁটিতে বৃষভেবাক্লান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুক্কুটের যেমন সুন্দর তাম্রচূড়া ও পক্ষসকল আছে কুক্কুটির তেমন নাই। এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, উচ্চশ্রেণীর জীবদিগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী। মনুষ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টিকর্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছে, এমন বোধ হয় না। হে মূল "বিদ্যাসুন্দর" কার! তোমার মনে কি উদিত হইয়াছিল? এইজন্যই কি তুমি নায়কের নাম সুন্দর রাখিয়াছিলে? তুমি কি বুঝিয়াছিলে যে, স্ত্রীলোক যত কেন বিদ্যাবতী হউক না, পুরুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও বুদ্ধির নিকটে তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে?

সৌন্দর্য বাহার যৌবনকালে। কিন্তু রূপান্ধ ভামিনীগণ! তোমাদিগের যৌবন কতক্ষণ থাকে? জোয়ারের জলের মত আসিতে

আসিতেই যায়। কুড়ি হইলেই তোমরা বুড়ি হইলে। অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদিগের অঙ্গসকল শিথিল হইয়া পড়ে। বয়স আসিয়া শীঘ্রই তোমাদিগের গলায় লাবণ্যমালা ছিঁড়িয়া লয়। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ পুরুষের যে শ্রী থাকে, বিশ-পঁচিশের উর্দ্ধে তোমাদিগের তাহা থাকে না। তোমাদিগের রূপের স্থিতি সৌদামিনীর ন্যায়, ইন্দ্রধনুর ন্যায় মুহূর্তের জন্য না হউক, অত্যল্পকালের জন্য সন্দেহ নাই। যাহারা রূপ-ভোগে উন্মত্ত, আমি আহারে বসিলেই তাহাদের যন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারি, আমার জীবনে ঘোর দুঃখ যে, অন্নব্যঞ্জন পাতে দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তেমনি স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যরূপ বুকুড়ী চালের ভাত, প্রণয়কলাপাতে ঢালিতে ঢালিতে ঠাণ্ডা হইয়া যায়—আর কাহার সাধ্য খায়? শেষে তেঁতুল মাখিয়া, একটু আদা-লবণের ছিটা দিয়া কোনরূপে গলাধঃকরণ করিতে হয়।

হে সৌন্দর্যগর্বিতা কামিনীকুল। সত্যি করিয়া বল দেখি, এই রূপ ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই কি তোমাদিগের রূপে এত আদর? ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতে, ভাল করিয়া উপভোগ করিতে না করিতে অন্তর্হিত হইয়া যায় বলিয়া তোমাদিগের রূপের জন্য কি পুরুষেরা পিপাসিত চাতকের ন্যায় উন্মত্ত? অপরিজ্ঞাত হারাধন বলিয়াই কি তোমরা উহার প্রকৃত মূল্যনির্ণয়ে অশক্ত? কেবল ক্ষণস্থায়ী পদার্থ বলিয়া নয়, অপর কারণেও স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য মনোহর মূর্তি ধারণ করে। যে সকল গ্রন্থকারদিগের মত ভূমণ্ডলে গ্রাহ্য হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই পুরুষ, এ কারণে আমার বিবেচনায়, অনুরাগ-নেত্রে কামিনী কুলের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কথাই আছে, "যার যাতে মজে মন, কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম।" যে রমণীগণ প্রণয়ের পদার্থ তাহাদিগকে কে সহজ চক্ষুতে দেখিবে? সুন্দর মুকুরের প্রভাবে দৃষ্ট বস্তু কুৎসিত হইলেও সুন্দর দেখাইবে, মনোমোহিনীর রূপ নিরীক্ষণকালে তাহাকে প্রীতির অঞ্জনে মাখাইয়া দেখিব, পুরুষাপেক্ষা তাহার মাধুর্য কেন না অধিক হইবে?

হে প্রণয়দেব পাশ্চাত্য-কবিরা তোমাকে অন্ধ বলিয়াছেন।

কথাটা মিথ্যা নয়। তোমার প্রভাবে লোক প্রিয় বস্তুর দোষ দেখিতে পায় না। তোমার অঞ্জনে যাহার নেত্র রঞ্জিত হইয়াছে, সে বিশ্ব বিমোহন পদার্থ-পরম্পরায় পরিবৃত্ত থাকে। বিকট মূর্তিকে সে মনোহর দেখে। কর্কশ স্বরকে সে মধুময় ভাবে। প্রেতিনীর অঙ্গ-ভঙ্গীকে মৃদু মন্দ মারুতে দোদুল্যমানা ললিতলবঙ্গলতার লাবণ্যলীলা অপেক্ষাও সুখকরী জ্ঞান করে। এ জন্যই চীনদেশে খাঁদা নাকের আদর, এ জন্যই বিলাতী বিবিদের রাঙ্গা চুল ও বিড়াল-চোখের আদর, এজন্যই কাফ্রিদেশে স্থূল ওষ্ঠাধরের আদর। এজন্য বাঙ্গাল দেশে উল্কিচিত্রিত মিশিকলঙ্কিত চাঁদবানের আদর। এ জন্য মানব সমাজে স্ত্রীরূপের আদর। আর যদি স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় মনের কথা মুখে আনিতেন, তাহা হইলে হে প্রণয়দেব, নিজের গুণে হউক না হউক, অন্ততঃ তোমার গুণেও আমরা শুনিতে পাইতাম যে, পুরুষের সৌন্দর্যের কাছে স্ত্রীলোকের রূপ কিছুই নয়। যদিও অন্তরের ভাব বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিতে মহিলাগণ অত্যন্ত সঙ্কুচিতা', তথাপি, কার্য দ্বারা তাহাদিগের আন্তরিক গূঢ় তত্ত্বগুলি কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে! কে না দেখিয়াছে যে, সুন্দরীরা পরস্পরের সৌন্দর্য স্বীকার করিতে চাহেন না অথচ পুরুষের ভক্ত লইয়া বসেন? ইহাতে কি বুঝাইতেছে না যে, মনে মনে তাঁহারা স্ত্রীলোকের রূপাপেক্ষা পুরুষের রূপের পক্ষপাতিনী?

রূপ রূপ করিয়া স্ত্রীলোকের সর্বনাশ হইয়াছে। সকলেই ভাবে রূপই কামিনীকুলের মহামূল্য ধন, রূপই কামিনীকুলের সর্বস্ব। সুতরাং মহিলাগণ যাহা কিছু কাম্য বস্তুর প্রার্থনা করেন, লোকে কেবল রূপের বিনিময়েই দিতে চায়। ইহাতেই মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক, বীরাঙ্গনাবর্গের সৃষ্টি। ইহাতেই পরিবারমধ্যে স্ত্রীলোকের দাসত্ব।

যখন আমি উৎকৃষ্টা যোষিদ্বর্গের বিষয়ে চিন্তা করিতে যাই; তখনই আমার মানসপটে সহমরণ প্রবৃত্তা সতীর মূর্তি জাগিয়া উঠে। আমি দেখিতে পাই যে, চিতা জ্বলিতেছে, পতির পদ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুভাশনমধ্যে সাধ্বী বসিয়া আছেন, আস্তে আস্তে

বহ্নি বিস্তৃত হইতেছে, এক অঙ্গ দগ্ধ করিয়া অপর অঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। অগ্নিদগ্ধ, স্বামীচরণ ধ্যান করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে হরিবোল বলিতেছেন বা বলিতে সঙ্কেত করিতেছেন। দৈহিক ক্লেশ-পরিচায়ক লক্ষণ নাই। আনন প্রফুল্ল ক্রমে পাবকশিখা বাড়িল, জীবন ছাড়িল, কায়া ভস্মীভূত হইল। ধন্য সহিষ্ণুতা! ধন্য প্রীতি! ধন্য ভক্তি।

যখন আমি ভাবি যে, কিছুদিন হইল, আমাদিগের দেশীয় অবলা অঙ্গনাগণ কোমলাঙ্গী হইয়াও এইরূপে মরিতে পারিত, তখন আমার মনে নূতন আশার সঞ্চার হয়। তখন আমার বিশ্বাস হয় যে মহত্ত্বের বীজ আমাদিগের অন্তরেও নিহিত আছে। কালেও কি আমরা মহত্ত্ব দেখাইতে পারিব না? হে বঙ্গপৌরাঙ্গনাগণ—তোমরা এ বঙ্গদেশের সার রত্ন। তোমাদের মিছা রূপের বড়ায়ে কাজ কি?

নবম সংখ্যা

ফুলের বিবাহ

বৈশাখ মাস—বিবাহ মাস। আমি ১লা বৈশাখে নসীবাবুর ফুলবাগানে বসিয়া একটি বিবাহ দেখলাম। ভবিষ্যৎ বর-কন্যাদিগের শিক্ষার্থ লিখিয়া রাখিতেছি।

মল্লিকাফুলের বিবাহ। বৈকাল-শৈশব, অবসান প্রায়, কলিকা-কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া আসিল। কন্যার পিতা বড়লোক নহে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ, তাহাতে আবার অনেকগুলি কন্যাভারগ্রস্ত। সম্বন্ধের অনেক কথা হইতেছিল, কিন্তু কোনটা স্থির হয় নাই। উদ্যানের রাজা স্থলপদ্ম নির্দোষ পাত্র বটে, কিন্তু বড় উঁচু, স্থলপদ্ম অতদূর নামিল না। জবা এ বিবাহে অসম্মত ছিল না, কিন্তু জবা বড় রাগী, কন্যা-কর্তা পৌছাইলেন। গন্ধরাজ পাত্র ভাল, কিন্তু বড় দেমাগ, প্রায় তাঁহার বর পাওয়া যায় না। এইরূপ অব্যবস্থার সময়ে ভ্রমরাজ ঘটক হইয়া মল্লিকা-বৃক্ষসদনে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন—

"গুণ! গুণ! গুণ! মেয়ে আছে?"

মল্লিকাবৃক্ষ পাতা নাড়িয়া সায় দিলেন, "আছে।" ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "গুণ গুণ গুণ গুণ। গুণাগুণ। মেয়ে দেখিব।" বৃক্ষ শাখা নত করিয়া, মুদিতনয়না, অবগুণ্ঠনবতী কন্যা দেখাইলেন।

ভ্রমর একবার বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিলেন, "গুণ। গুণ। দেখিতে চাই। ঘোমটা খোল।"

লজ্জাশীলা কন্যা কিছুতেই ঘোমটা খুলে না। বৃক্ষ বলিলেন, "আমার মেয়েগুলি লাজুক। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মুখ দেখাইতেছি।"

ভ্রমর ভোঁ করিয়া স্থলপদ্মের বৈঠকখানায় গিয়া রাজপুত্রের সঙ্গে ইয়ারকি করিতে বসিলেন। এ দিকে মল্লিকার সন্ধ্যা ঠাকুরাণী-দিদি আসিয়া তাহাকে কত বুঝাইতে লাগিল—বলিল, "দিদি একবার ঘোমটা খোল—নইলে বর আসিবে না—লক্ষ্মী আমার, চাঁদ আমার, সোনা আমার, ইত্যাদি। সে কতবার নাড়িল, কতবার রাগে মুখ ঘুরাইল, কতবার বলিল, "ঠান্‌দিদি ; তুই যা।" কিন্তু শেষে সন্ধ্যার স্নিগ্ধভাবে মুগ্ধ হইয়া মুখ তুলিল। তখন ঘটক মহাশয় ভোঁ করিয়া রাজবাড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটকালীতে মন দিলেন। কন্যার পরিমলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "গুণ, গুণ। গুণ গুণাগুণ। কন্যা গুণবতী বটে। ঘরে মধু কত ?"

কন্যাকর্তা বৃক্ষ বলিলেন, "ফর্দ দিবেন, কড়ায়গণ্ডায় বুঝাইয়া দিব।" ভ্রমর বলিলেন, গুণ গুণ! আপনার গুণ—ঘটকালীদা ?"

কন্যাকর্তা শাখা নাড়িয়া সায় দিল, "তাই হবে।"

ভ্রমর—"বলি, ঘটকালীর আগাম দিলে হয় না ? নগদ দান বড় গুণ—গুণ—গুণ গুণ।"

ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বিরক্ত হইয়া সকল শাখা নাড়িয়া বলিল, "আগে বরের কথা বল—বর কে ?"

ভ্রমর—"বর অতি সুপাত্র। তাঁর অনেক গুণ—ণ—ণ।"

"কে তিনি ?"

"গোলাবলাল গঙ্গোপাধ্যায়। অনেক—গুণ-ণ-ণ।"

এই সকল কথপোকথন মনুষ্য শুনিতে পায় না। আমি শুনিতে লাগিলাম, কুলাচার্য মহাশয় পাখা ঝাড়িয়া, ছয় পা ছড়াইয়া গোলাবের মহিমা কীর্তন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন যে, গোলাববংশ বড় কুলীন। কেন না, ইহারা "ফুলে" মেল।

যাহা হউক, ঘটকরাজ কোনরূপে সম্বন্ধ স্থির করিয়া ভোঁ করিয়া উড়িয়া গিয়া গোলাববাবুর বাড়িতে খবর দিলেন। গোলাব তখন বাতাসের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিল। ভ্রমর বলিল, "আজিকালি ফুটিবে।"

গোধূলি লগ্ন উপস্থিত, গোলাব বিবাহ যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উচ্চিঙ্গড়া নহবত বাজাইতে আরম্ভ করিল। মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইয়াছিল, কিন্তু রাতকানা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল না। খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিল। আকাশে তারাজি হইতে লাগিল, কোকিল আগে আগে ফুকরাইতে লাগিল। অনেক বরযাত্রী চলিল, স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাসনে অসুস্থকায় বলিয়া, আসিতে পারিলেন না, কিন্তু জবাগোষ্ঠি—শ্বেতজবা, রক্তজবা, জরদ জবা প্রভৃতি সবংশে আসিয়াছিল। করবীর দল, সেকেলে রাজাদিগের মত উচ্চ ডালে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সেঁউতি নিতবর হইবে বলিয়া সাজিয়া আসিয়া দুলিতে লাগিল। গরদের জোড় পরিয়া চাঁপা আসিয়া দাঁড়াইল। বেলা ব্রাণ্ডি টানিয়া আসিয়াছিল। উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। গন্ধরাজেরা বড় বাহার দিয়া দলে দলে আসিয়া গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল। অশোক নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত, সঙ্গে এক পাল পিঁপড়া মোসাহেব হইয়া আসিয়াছে। তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাতের জ্বালা বড়—কোন্ বিবাহে এরূপ বরযাত্র জোটে, আর কোন্ বিবাহে না তাহারা হুল ফুটাইয়া বিবাদ বাধায়? কুরুবক, কুটজ প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্র আসিয়াছিলেন ঘটকমহাশয়ের কাছে তাঁহাদের পরিচয় শুনিবেন। সর্বত্রই তিনি যাতায়াত করেন এবং কিছু কিছু মধু পাইয়া থাকেন।

আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম। দেখি, বরপক্ষের বড় বিপদ। বাতাস বাহকের বায়না লইয়াছিলেন। তখন হু-হুম করিয়া অনেক মস্নদানি করিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের সময়ে কোথায় লুকাইলেন কেহ খুঁজিয়া পায় না। দেখিলাম, বর, বরযাত্র, সকলে অবাক হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মল্লিকাদিগের কুল যায় দেখিয়া আমিই বাহকের কার্য স্বীকার করিলাম। বর, বরযাত্র সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপুরে গেলাম।

সেখানে দেখিলাম, কন্যাকুল, সকল ভগিনী, আহ্লাদেই ঘোমটা খুলিয়া, মুখ ফুটাইয়া, পরিমল ছুটাইয়া সুখের হাসি হাসিতেছে। যূথী, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধা প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী-আচার করিয়া বরণ করিল। দেখিলাম, পুরোহিত-উপস্থিত। নসীবাবুর নবম বর্ষীয়া কন্যা (জীবন্ত কুসুমরূপিণী) কুসুমলতা সুঁচ-সুতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কন্যাকর্তা কন্যা সম্প্রদান করিলেন। পুরোহিত মশায় দুইজনকে এক সুতায় গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেন।

তখন বরকে বাসরঘরে লইয়া গেল। কত যে রসময়ী মধুময়ী সুন্দরী সেখানে ঘেরিয়া বসিল, তাহা কি বলিব। প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি টগর সাদাপ্রাণে বাঁধা রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন। তখন—"কমলাকান্ত—ওঠ, বাড়ী যাই—রাত হয়েছে, ও কি, ঢলে পড়বে যে?"

কুসুমলতা এই কথা বলিয়া আমার গা ঠেলিতেছিল। চমক হইল দেখিলাম, কিছুই নাই। সেই পুষ্পবাসর কোথায় মিশিল? মনে করিলাম সংসার অনিত্য বটে—এই আছে, এই নাই। সে রম্য বাসর কোথায় গেল—সেই হাস্যমুখী শুভ্রস্মিত সুধাময়ী পুষ্পসুন্দরী সকল কোথায় গেল? যেখানে সব যাইবে, সেইখানে—স্মৃতির দর্পণতলে, ভূত-সাগরগর্ভে। যেখানে রাজা, প্রজা, পর্বত, সমুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি গিয়াছে বা যাইবে, সেইখানে ধ্বংসপুরে। এই বিবাহের ন্যায় সব শূন্যে মিলাইবে, সব বাতাসে গলিয়া যাইবে—কেবল থাকিবে কি? ভোগ? না, ভোগ্য না থাকিলে ভোগ থাকিতে পারে না। তবে কি স্মৃতি?

কুসুম বলিল, "ওঠ না, কি কচ্চো ?"

আমি বলিলাম, "দূর পাগলী, আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম।"

কুসুম ঘেঁসে এসে, হেসে হেসে কাছে দাঁড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার বিয়ে কাকা ?"

আমি বলিলাম, "ফুলের বিয়ে।"

"ও পোড়া কপাল, ফুলের ? আমি বলি কি ? আমিও যে এই ফুলের বিয়ে দিয়েছি।"

"কই ?"

"এই যে মালা গাঁথিয়াছি।" দেখিলাম, সেই মালায় আমার বর কন্যা রহিয়াছে।

দশম সংখ্যা

বড়বাজার

প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি। আমি নসীরামবাবুর গৃহে আসিয়া অবধি তাহার নিকট ক্ষীর, সর, দধি, দুগ্ধ এবং নবনীত খাইতেছি। এক্ষণে সে মূল্য চাহিতেছে।

সুতরাং তাহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা।

প্রসন্নের দুগ্ধ-দধি আছে, সে দিবে, আমার উদর আছে, খাইব তাহার সঙ্গে এই সম্বন্ধ। ইহাতে মূল্য চাহে কোন্ অধিকারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। প্রসন্ন বলে, আমি অধিকার অনধিকার বুঝি না, আমার গোরু, আমার দুধ, আমি মূল্য লইব। সে বুঝে না যে, গোরু কাহারও নহে, গোরু গোরুর নিজের, দুধ যে খায় তারই।

তবে এ সংসারে মূল্য লওয়া একটি রীতি আছে, স্বীকার করি। কেবল খাদ্য-সামগ্রী কেন সকল সামগ্রীই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। দুধ, দই, চাল, দাল, বিদ্যাবুদ্ধিও মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। অনেক ভাল

কথা মূল্য দিয়া কিনিয়া থাকেন, হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া ধর্ম কিনিয়া থাকেন। যশ মান অতি অল্প মূল্যেই ক্রীত হইয়া থাকে। ভাল সামগ্রী মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে, ইহাও কতক বুঝিতে পারি কিন্তু মনুষ্য এমনই মূল্যপ্রিয় যে, বিনামূল্যে মন্দসামগ্রীও কেহ কাহাকে দেয় না। যে বিষ খাইয়া মরিবার বাসনা করে, তাহাও তাহাকে বাজার হইতে মূল্য দিয়া কিনিয়া খাইতে হইবে!

অতএব এই বিশ্বসংসার একটি বাজার—সকলেই সেখানে আপন আপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছেন। সকলের উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি। সকলেই সেখানে অনবরত ডাকিতেছে, "আমার দোকানে ভাল জিনিষ—খরিদ্দার চ'লে আয়"—সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য—খরিদ্দারের চোখে ধূলা দিয়া রদ্দিমাল পাচার করিবে। দোকানদার-খরিদ্দারে কেবল যুদ্ধ, কে কাকে ফাঁকি দিতে পারে। সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া মনের দুঃখে আফিমের মাত্রা চড়াইলাম। তখন জ্ঞাননেত্র ফুটিল। সম্মুখে ভবের বাজার সুবিস্তৃত দেখিলাম, অসংখ্য দোকানদার দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে—অসংখ্য খরিদ্দারে খরিদ করিতেছে—দেখিলাম, সেই অসংখ্য দোকানদারে অসংখ্য খরিদ্দার পরস্পরকে অসংখ্য অঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে। আমি গামছা কাঁধে করিয়া বাজার করিতে বাহির হইলাম। প্রথমেই রূপের দোকানে গেলাম। যে জিনিষ ঘরে নাই, সেই জিনিষের দোকানে আগে যাইতে হয়। দেখিলাম যে, সংসারে সেই মেছোহাটা। পৃথিবীর রূপসীগণ মাছ, ঝুড়ি-চুপড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। দেখিলাম ছোট বড় রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ্, চুনো পুঁটি, কই, মাগুর, খরিদ্দারের জন্য লেজ আছড়াইয়া ধড়ফড় করিতেছে। যত বেলা বাড়িতেছে তত বিক্রয়ের জন্য খাবি খাইতেছে। মেছনীরা ডাকিতেছে; "মাছ নেবে গো! কুল-পুকুরের সস্তা মাছ অমনি ছাড়বো বোঝা বিক্রি হইলেই বাঁচি।" কেহ ডাকিতেছে "মাছ নেবে গো—ধন সাগরের মিঠা মাছ; যে কেনে তার পুনর্জন্ম হয় না—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিবিধ মুণ্ডে পরিণত হইয়া

তার ঘরদ্বারে ছড়াছড়ি যায়, যার সাধ্য থাকে কিনিবে। সোনার হাঁড়িতে চোখের জলে সিদ্ধ করিয়া হৃদয়-আগুনে কড়া জ্বাল দিয়া রাঁধিতে হয়—কে খরিদ্দার সাহস করিস আয়। সাবধান। হীরার কাঁটা—নাতি ঝাঁটা—গলায় বাধলে পাগুড়ীরুপী, বিড়ালের পায়ে পড়িতে হয়, কাঁটার জ্বালায় খরিদ্দার হলে কি পালায়?" কেহ ডাকিতেছে, ওরে আমার সরম পুঁটি, বিক্রি হইলে উঠি। ঝোলে, ঝালে, অম্বলে, তেলে, ঘিয়ে, জলে, যাতে দেবে ফেলে, রান্না যাবে চলে, সংসারের দিন সুখে কাটাবে, আমার এই সরম পুঁটির বলে।" কেহ বলিতেছে "কাঁদা খেঁচে চাঁদা এনেছি—দেখে খরিদ্দার পাগল হয়। কিনে কিনে নিয়ে ঘর আলো কর।"

রূপের বাজার ছাড়িয়ে বিদ্যার বাজারে গেলাম, দেখিলাম, এখানে ফলমূল বিক্রয় হয়। এক স্থানে দেখিলাম কতগুলি ফোঁটাকাটা টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ তসর গরদ পরিয়া, নামাবলি গায়ে, ঝুনা নারিকেলের দোকান খুলিয়া বসিয়া খরিদ্দার ডাকিতেছেন—"বেচি আমরা ঘটত্ব-পটত্ব-গত্ত্বণত্ব, ঘরে চাল থাকিলে স্বত্ব,—নইলে—ন-ত্ব! দ্রবত্ব জাতিত্ব-গুণত্ব পদার্থ, বাঁশের শ্রাদ্ধে বিদায় না দিলেই তুমি বেটা অপদার্থ। পদার্থতত্ত্ব দামে, ঝুনা নারিকেল খাইতে কঠিন—তাহার প্রথম ছোবড়ায় লেখে যে ব্রাহ্মণীই পরম পদার্থ। অভাব নামে নারিকেল চতুর্বিধ, তোমার ঘরে ধন আছে, আমার ঘরে নাই। ইহা অন্যোন্যভাব। যতক্ষণ প্রাগভাব। খরচ হইয়া গেলেই ধ্বংসাভাব আর আমাদের ঘরে সর্বদাই অত্যন্ত অভাব। অভাব নিত্য কি অনিত্য, যদি সংশয় থাকে, তবে আমাদের ভাণ্ডারে উঁকি মার। দেখিবে নিত্যই অভাব। অতএব আমাদের ঝুনা নারিকেল কেনো! ব্যাপ্য, ব্যাপক, ব্যাপ্তি—এ নারিকেলের শাঁস। ব্রাহ্মণের হস্ত হইল ব্যাপ্য, রজত হইল ব্যাপক আর তুমি দিলেই ঘটিল ব্যাপ্তি। এই ঝুনা নারিকেল কেনো, এখনই বুঝিবে। দেখ বাপু কার্য-কারণ-সম্বন্ধ বড় গুরুতর কথা, টাকা দাও, এখনই একটা কার্য হইবে, কম দিলেই অকার্য। আর কারণ বুঝাইব কি, এই যে দুই প্রহর রৌদ্রে

ঝুনা নারিকেল বেচিতে আসিয়াছি, ব্রাহ্মণই তাহার কারণ—কিছু যদি না কেনো, তবে নারিকেল বন্ধ। অকারণ! অতএব নারিকেল মাথায় ঠুকিয়া মরিব।"

ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রখর তপনতপ্ত ঘর্মাক্ত ললাট এবং বাগবিতণ্ডা-জনিত অধর-সুধাবৃষ্টি দেখিয়া দয়া হইল—জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁ ভট্টাচার্য মহাশয়। ঝুনা নারিকেল কিনিতে আপত্তি নাই, কিন্তু দোকানে দা আছে? ছুলিব কি প্রকারে?"

"না বাপু, দা রাখি না।"

"তবে নারিকেল ছোল কিসে?"

"আমরা ছুলি না, আমরা কামড়াইয়া ছোবড়া খাই।"

শুনিয়া আমি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া পাশের দোকানে গেলাম।

দেখিলাম, ইহাদিগের সম্মুখেই এক্সপেরিমেণ্টেল সায়েন্সের দোকান।

কতকগুলি সাহেব দোকানদার ঝুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি প্রভৃতি ফল বিক্রয় করিতেছেন। ঘরের উপরে বড় বড় পিতলের অক্ষরে লেখা :—

Messrs Brown Jones and Robinson

Nut Suppliers

Established 1757

On the Field of Plassey

Messrs Brown Jones and Robinson

Offer To The Indian Public

A Large Asfortment of

Nuts, Physical, Metaphysical, Logical, Illogical and sufficient To Break.

THE JAWS AND

Dislocate Teeth Of

All Indian Youths

Who stand in need of Having Their Dental superfluities Calcutta.

দোকানদার ডাকিতেছেন, "আয় কালাবাচক—Experimeı.tal Science খাবি আয়! দেখ, ১ নম্বর এক্সপেরিমেণ্টে—ঘুসি, ইহাতে দাঁত উপড়ে, মাথা ফাটে এবং হাড় ভাঙ্গে। আমরা এই সকল এক্সপেরিমেণ্ট বিনামূল্যে দেখাইয়া থাকি—পরের মাথা বা নরম হাড় পাইলেই হইল। আমরা স্থূলপদার্থের সংযোগ-বিয়োগ-সাধনে পটু—রাসায়নিক বলে বা বৈদ্যুতিক বলে, চৌম্বক বলে, জড়পদার্থের বিশ্লেষণেই সুদক্ষ—সর্বাপেক্ষা মুষ্ট্যাঘাতের বলে মস্তকাদির বিশ্লেষণেই আমরা কৃতকার্য। মাধ্যাকর্ষণ, যোগিকাকর্ষণ, চৌম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ আকর্ষণের কথা আমরা অবগত আছি, কিন্তু সর্বাপেক্ষা কেশাকর্ষণেই আমরা কৃতবিদ্য। এই সংসারে জড়পদার্থের নানাবিধ যোগ দেখা যায়। যথা—বায়ুতে অম্লজান ও যবক্ষারজানের সামান্য যোগ, জলে জলজান ও অম্লজানের রাসায়নিক যোগ আর তোমাদিগের পৃষ্ঠে আমাদিগের মুষ্টিযোগ। অতএব এই সকল আশ্চর্য ব্যাপার দেখিবে যদি, মাথা বাড়াইয়া দাও, এক্সপেরিমেণ্ট করিব। দেখিব, গ্রাভিটেশনের বলে এই সকল নারিকেলাদি তোমাদের মস্তকে পড়িবে, পার্কশন নামক অদ্ভুত শাব্দিক রহস্যেরও পরিচয় পাইবে এবং দেখিবে, তোমার মস্তিষ্কস্থিত স্নায়বপদার্থের গুণে বেদনা অনুভব করিবে।

"অগ্রিম মূল্য দিও। তাহা হইলে চ্যারিটিতে এক্সপেরিমেণ্ট খাইতে পারিবে।"

আমি এই সকল দেখিতে শুনিতেছিলাম, এমত সময়ে সহসা দেখিলাম যে, ইংরেজ দোকানদারেরা লাঠি হাতে, দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণদিগের ঝুনা নারিকেলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন।

দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া নামাবলী ফেলিয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাহেবেরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠিয়া লইয়া আসিয়া বিলাতি অস্ত্রে ছেদন করিয়া সুখে আহার করিতে লাগিলেন! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "এ কি হইল?" সাহেবেরা ইহাকে বলে "Asiatic Researches", আমি তখন ভীত হইয়া আত্মশরীরের কোন প্রকার Anatomical researches" আশঙ্কা করিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলাম।

সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃতফল বেচিতেছেন! বুঝিলাম, ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম আর কতকগুলি লীচু, পীচ, পেয়ারা, আনারস, আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন—বুঝিলাম এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কিসের দোকান?"

বালকেরা বলিল, "বাঙ্গলা সাহিত্য।"

"বেচিতেছে কে?"

"আমরাই বেচি। দুই একজন বড় মহাজনও আছেন। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পত্রাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।"

"কিনিতেছে কে?"

"আমরাই।"

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।

তাহার পরে কলুপটিতে গেলাম। দেখিলাম, যত উমেদার মোসাহেব সকলে কলু সাজিয়া তেলের ভাঁড় লইয়া সারি সারি বসিয়া গিয়াছে। তোমার ট্যাঁকে চাকরী আছে, শুনিতে পাইলেই পা টানিয়া ভাঁড় বাহির করিয়া তেল মাখাইতে বসে। চাকরী না থাকিলেও যদি থাকে, এই ভরসায় পা টানিয়া লইয়া তেল লেপিতে বসে।

তোমার কাছে চাকরী নাই—নাই—নাই—নগদ টাকা আছে—ত—আচ্ছা, তাই দাও—তেল দিয়েছি। কাহারও প্রার্থনা তোমার বাগানে বসিয়া তুমি যখন ব্র্যাণ্ডি খাইবে, তোমার চরণে তৈল মাখাইব—আমার কন্যার বিবাহটি যেন হয়। কাহারও আব্দার, তোমার কানে অবিরত খোসামোদের গন্ধতৈল ঢালিব—বাড়ীর প্রাচীরটি যেন দিতে পারি। কাহারও কামনা, তোমার তোষাখানায় বাতি জ্বালিয়া দিব—আমার খবরের কাগজটি যেন চলে। শুনিয়াছি, কলুদিগের টানাটানিতে অনেকের পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে। আমার শঙ্কা পাছে কোন কলু আফিঙের প্রার্থনায় আমার পায়ে তেল দিতে আরম্ভ করে আমি পলায়ন করিলাম।

তার পর যশের ময়রাপটি। সংবাদপত্র লেখক নামে ময়রাগণ, গুড়েসন্দেশের দোকান পাতিয়া নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে—রাস্তায় লোক বসিয়া সন্দেশে গতাইয়া দিয়া হাত পাতিতেছে, মূল্য না পাইলেই কাপড় কাড়িয়া লইতেছে এ দিকে তাদের বিক্রয়ে যশের দুর্গন্ধে পথিক নাসিকা আবৃত করিয়া পলায়ন করিতেছেন। দোকান-দারগণ বিনা গুড়ে আশ্চর্য সন্দেশ করিয়া সস্তাদরে বিক্রয় করিতেছেন। কেহ টাকাটা সিকেটায়, আনা দু আনায়; কেহ কেবল খাতিরে—কেহ বা একসাজ ফলাহার পেলেই ছাড়ে—কেহ বা বাবুর গাড়িতে চড়িতে পেলেই যশোবিক্রয় করেন! অন্যত্র রাজপুরুষগণ মিঠাইওয়ালা সাজিয়া রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুর, খেতাব, খেলাত, নিমন্ত্রণ, ধন্যবাদ প্রভৃতি মিঠাই লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়া আছেন চাঁদা, সেলাম, খোসামোদ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই বেচিতেন। বিক্রয়ের বড় বেবন্দোবস্ত—কেহ সর্বস্ব নিয়া একঠোঙ্গা পাইতেছে না, কেহ শুধু সেলামে দেহমন লইয়া যাইতেছে। এইরূপ অনেক দোকান দেখিলাম, কিন্তু পচা মাল সর্বত্র আধ দরে বিক্রয় হইতেছে, খাঁটি দোকান দেখিলাম না। কেবল একখানি দেখিলাম, তাহা অতি চমৎকার।

দেখিলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার—কিছু দেখা যায়

না। ডাকিয়া দোকানদারের উত্তর পাইলাম না, কেবল এক সর্ব প্রাণিভীতিসাধক অনন্ত গর্জন শুনিতে পাইলাম, অল্পালোকে দ্বারে ফলক-লিপি পড়িলাম। যশের গণ্যশালা। বিক্রেয়—অনন্ত যশ। বিক্রেতা—কাল, মূল্য—জীবন।"

জীবনে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

আর কোথাও যশ বিক্রয় হয় না।

পড়িয়া ভাবিলাম আমার যশে কাজ নাই, কমলাকান্তের প্রাণ বাঁচিলে অনেক যশ হইবে।

বিচারের বাজারে গেলাম,—দেখিলাম, সেই কসাইখানা, টুপী মাথায়, শামলা মাথায়, ছোট বড় কসাই সকল ছুরি হাতে গোরু কাটিতেছে। মহিষাদি বড় বড় পশু সকল শৃঙ্গ নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে,—ছাগ, মেষ এবং গোরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশুসকল ধরা পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া গোরু বলিয়া একজন কসাই বলিল, "এও গরু—কাটিতে হইবে।" আমি সেলাম করিয়া পলাইলাম।

আর বড়বাজারে বেড়াইবার সাধ রইল না,—তবে প্রসন্নের উপর রাগ ছিল বলিয়া একবার দইয়েহাটা দেখিতে গেলাম,—গিয়া প্রথমেই দেখিলাম যে, সেখানে খোদ কমলাকান্ত চক্রবর্তী নামে গোয়ালা—দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি হইয়া বসিয়া আছে,—আপনি ঘোল খাইতেছে এবং পরকে খাওয়াইতেছে।

তখন চমক হইল—চক্ষু চাহিলাম—দেখিলাম, নসীবাবুর বাড়িতেই আছি। ঘোলের হাঁড়ি কাছে আছে বটে। প্রসন্ন এক হাঁড়ি ঘোল আমাকে সাধিতেছে—"চক্রবর্তী মশাই রাগ করিও না। আজ আর দুধ নাই—এই ঘোলটুকু আনিয়াছি—ইহার দাম দিতে হইবে না।"

কমলাকান্তের পত্র

প্রথম সংখ্যা

১। কি লিখব ?

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু—

আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী, সাবেক নিবাস শ্রীশ্রী৺নসীধাম, আপনাকে আমি প্রণাম করি। আপনার নিকট আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় নাই, কিন্তু আপনি নিজগুণে আমার বিশেষ পরিচয় লইয়াছেন দেখিতেছি। ভীষ্মদেব খোসনবীশ জুয়াচোর লোক, আমি পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম—আমি দপ্তরটি তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তীর্থদর্শনে যাত্রা করেছিলাম। তিনি সেই অবসর পাইয়া সেইটি আপনাকে বিক্রয় করিয়াছেন। বিক্রয় কথাটি আপনি স্বীকার করেন নাই কিন্তু আমি জানি, ভীষ্মদেব ঠাকুর বিনা মূল্যে শালগ্রামকে তুলসী দেন না, বিনা মূল্যে যে আপনাকে শ্রীকমলাকান্ত-প্রণীত দপ্তর দিবেন এমত সম্ভাবনা অতি বিরল। এই জুয়াচুরির কথা আমি এত দিন জানিতাম না, দৈবাধীন একটি জুতা কিনিয়া এ সন্ধান পাইলাম। একখানি ছাপার কাগজে জুতা জোড়াটি বান্ধা ছিল, দেখিয়া ভাবিতেছিলাম যে, কাহার এমন সৌভাগ্যের উদয় হইল যে, তাহার রচনা শ্রীমৎ কমলাকান্ত শর্মার চরণ-যুগলের ব্যবহার্য পাদুকাদ্বয় মণ্ডন করিতেছে। মনে করিলাম, সার্থক তাহার লেখনী-ধারণ! সার্থক তাহার নিশীথ তৈলদাহ! সুর্যের দ্বারা তাহার রচনা পঠিত না হইয়া সাধুজনের চরণের সঙ্গে যে কোন প্রকার সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে, ইহা বঙ্গীয় লেখকের সৌভাগ্য। এই ভাবিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া দেখিলাম যে, কাগজখানি কি। পড়িলাম উপরে লেখা আছে "বঙ্গদর্শন," ভিতরে লেখা আছে "কমলাকান্তের দপ্তর।" তখন বুঝিলাম যে, আমারই এ পূর্বজন্মার্জিত সুকৃতির ফল।

আরও একটি কৌতূহল জন্মিল। বঙ্গদর্শন কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মহাশয় "বঙ্গ-দর্শনটা কি, তাহা বলিতে পারেন?" তিনি অনেকক্ষণ ভাবিলেন। অনেকক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "বোধ হয়, বঙ্গদেশ দর্শন করাই বঙ্গদর্শন!" আমি তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেক প্রশংসা করিলাম, কিন্তু অগত্যা অন্য বন্ধুকেও ঐ প্রশ্ন করিতে হইল।—অন্য বন্ধু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শকারের উপর যে রেফটি আছে, বোধ হয় তাহা মুদ্রাকরের ভ্রম, শব্দটি "বঙ্গদশন" অর্থাৎ বাঙ্গালার দাঁত। আমি তাকে চতুষ্পাঠি খুলিতে পরামর্শ দিয়া অন্য এক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বঙ্গশব্দে পূর্ব বাঙ্গলা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, ইহার অর্থ পূর্ববাঙ্গালা-দর্শন করিবার বিধি, অর্থাৎ A Guide to Eastern Bengal; এইরূপ বহু প্রকার অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে জানিতে পারিলাম যে, বঙ্গদর্শন একখানি মাসিক পত্রিকা এবং তাহাতে কমলাকান্তের মাসিক পিণ্ডদান হইয়া থাকে। এক্ষণে আবার শুনিতেছি, কোন ধনুর্ধর ঐ দপ্তরগুলি নিজ প্রণীত বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। আরও কত হবে।

অতএব বঙ্গদর্শন-সম্পাদক মহাশয়! অবগত হউন যে, আমি কমলাকান্ত শর্মা সশরীরে ইহজগতে অদ্যাপি অধিষ্ঠান করিতেছি এবং আপনাদিগের বিশেষ আপত্তি থাকিলেও আরও কিছুদিন অধিষ্ঠান করিব, এমত ইচ্ছা রাখি।

এক্ষণে কি জন্য আপনাকে অদ্য পত্র লিখিতেছি, তাহা অবগত হউন। উপরে দেখিতে পাইবেন, "শ্রীশ্রী৺নসীধাম" লিখিয়াছি—অর্থাৎ আমার নসীবাবু শ্রীশ্রী৺ঈশ্বরে বিলীন হইয়াছেন। ভরসা করি যে, তিনি সর্বাশ্রয়ে শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার গতি কোন্ পথে হইয়াছে, তাহার নিশ্চিত সংবাদ আমি রাখি না। কেবল ইহাই জানি যে, ইহলোকে তিনি নাই। অতএব আমারও আশ্রয় নাই! অহিফেনের কিছু গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কিছু বন্দোবস্ত করিতে পারেন? আমার দপ্তরের জন্য

আপনি খোসনবীশ মহাশয়কে কি দিয়াছিলেন, বলিতে পারি না; কিন্তু আমাকে এক আধ পোয়া আফিঙ্গ পাঠাইলেই (আমার মাত্রা কিছু বেশী) আমি এক একটি প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিব। আপনার মঙ্গল হউক। আপনি ইহাতে বিরক্তি করিবেন না, কিন্তু আপনার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত পাকাপাকি করিবার আগে গোটা-কতক কথা জিজ্ঞাস্য আছে। এ কমলাকান্তি কলে ফরমায়েসমত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত হয়—আপনার চাই কি? নাটক নবেল চাই না পলিটিকসের দরকার? কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা পাঠাইব, না সংক্ষিপ্ত সমালোচনার ব্যবহার দিব? বিজ্ঞান-শাস্ত্রে আপনার প্রসক্তি না ভৌগলিকতত্ত্বরসে আপনি সুরসিক? স্থূল কথাটা, গুরু বিষয় পাঠাইব, না লঘু বিষয় পাঠাইব? আমার রচনার মূল্য আপনি গজ দরে দিবেন, না মণ দরে দিবেন? আর যদি গুরু বিষয়েই আপনার অভিরুচি হয়, তবে বলিবেন, তাহার কি প্রকার অলঙ্কার সমাবেশ করিব। আপনি কোটেশন ভালবাসেন, না ফুটনোটে আপনার অনুরাগ? যদি কোটেশন বা ফুটোনোটের প্রয়োজন হয়, তবে কোন্ ভাষা হইতে দিব, তাহাও লিখিবেন। ইউরোপ ও অষ্ট্রিয়ার সকল ভাষা হইতে আমার কোটেশন সংগ্রহ করা হইয়াছে, আফ্রিকা ও আমেরিকার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই নাই। কিন্তু সেই সকল ভাষায় কোটেশন আমি অচিরাত প্রস্তুত করিব, আপনি চিন্তিত হইবেন না!

যদি গুরুবিষয়ক রচনা আপনার নিতান্ত মনোনীত হয়, তবে কি প্রকার গুরুবিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা, তাহাও জানাইবেন। আমি স্বয়ং সেদিকে কিছু করিতে পারি না পারি, আমার এই বড় সহায় জুটিয়াছে! ভীষ্মদেব খোসনবীশ মহাশয়ের পুত্র, যিনি ইউটিলিটি শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাকে আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। তিনি এক্ষণে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। এম-এ পাশ করিয়া বিদ্যার ফাঁস গলায় দিয়াছেন। গুরুবিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার। ইস্কুলের বই চাই কি? তিনি বর্ণপরিচয় হইতে রোমদেশের ইতিহাস পর্যন্ত

সকলই লিখিতে পারেন। ন্যাচারাল হিস্টিরিয়া একশেষ করিয়া রাখিয়াছেন এবং গোল্ডস্মিথকৃত এনিমেটেড ন্যাচরের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছেন। সে সব চাই কি? গুরুর মধ্যে গুরু যে পাটিগণিত ও জ্যামিতি তাহাতেও সাহসশূন্য নহেন। জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি চুলোয় যাক, চতুষ্কোণমিতিতেও তাঁহার অধিকার—দৈববিদ্যাবলে তিনি আপনার পৈতৃক চতুষ্কোণ পুকুরটিও মাপিয়া ফেলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, শুনিয়া লোকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। তাঁহার ঐতিহাসিক কীর্তির কথা কি বলিব? তিনি চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের একখানি জীবনচরিত দশ পনের পৃষ্ঠা লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সংকলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কোমত হবর্ট স্পেনসরের মতখণ্ডন আছে এবং ডারুইন যে বলেন, মাধ্যাকর্ষণবলে পৃথিবী স্থির আছে, তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে মালতীমাধব হইতে চারি-পাঁচটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সুতরাং এখানি মোটের উপরে ভারি রকমের গুরুবিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। ভরসা করি, সমালোচনাকালে আপনারা বলিলেন বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অদ্বিতীয়।

ভরসা করি গুরুবিষয় ছাড়িয়া লঘু-বিষয়ে আপনার অভিরুচি হইবে না। কেন না, সে সকলের কিছু অসুবিধা। খোসনবীশ পুত্র একখানি নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন বটে, নায়িকার নাম চন্দ্রকলা কি শশিরম্ভা রাখিবেন স্থির করিয়াছেন, তাঁহার পিতা বিজাপুরের রাজা ভীমসিংহ, আর নায়ক আর একটা কিছু সিংহ; এবং শেষ অঙ্কে শশিরম্ভা নায়কের বুকে ছুরি মারিয়া আপনি হা হতোহস্মি করিয়া মরিবেন, এই সকল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের অন্ত ও মধ্যভাগ কি প্রকার হইবে এবং অন্যান্য "নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ" কিরূপ করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। শেষ অঙ্কের ছুরি মারা সিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আটটা "হা সখি।" এবং তেরটা "কি হলো!" সমাবেশ

করিয়াছেন। শেষে একটি গীতও দিয়াছেন—নায়িকা ছুরি হস্তে করিয়া গাহিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নাটকের অন্যান্য অংশে কিছুই লেখা হয় নাই।

যদি নবেলে আপনার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলেও আমার অর্থাৎ খোসনবীশ কোম্পানী কিছু অপ্রস্তুত নহি। আমরা উত্তম নবেল লিখিতে পারি, তবে কি না ইচ্ছা ছিল যে বাজে নবেল না লিখিয়া ডনকুইক্‌সোট বা জিলব্লার পরিশিষ্ট লিখিব। দুর্ভাগ্যবশত এই দুইখানি পুস্তকের একখানিও এ পর্যন্ত আমাদের পড়া হয় নাই। সম্প্রতি মেকলের এসের পরিশিষ্ট লিখিয়া দিলে আপনার কার্য হইতে পারে কি? সেও নবেল বটে?

যদি কাব্য চাহেন, তবে মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলিবেন। মিত্রাক্ষর আমাদের হইতে হইবে না, আমরা পয়ার মিলাইতে পারি না। তবে অমিত্রাক্ষর যত বলিবেন, তত পারিব। সম্প্রতি খোসনবীশের ছানা জীমূতনাদবধ বলিয়া একখানি কাব্যের প্রথমখণ্ড লিখিয়া রাখিয়াছেন, ইহা প্রায় মেঘনাদবধের তুল্য—চারটি নামের প্রভেদ আছে মাত্র। চাই?

আর যদি লঘু-গুরু নব ছাড়িয়া. খোসনবীশী রচনা ছাড়িয়া সাফ কমলাকান্ত ঢঙ্গে আপনার রুচি হয়, তবে তাও বলুন আমার প্রণীত ছাইভস্ম যাহা কিছু লেখা থাকে তাহা পাঠাই। মনে থাকে যেন তাহার বিনিময়ে আফিঙ্গ লইব। ওজন কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইব—একতিল ছাড়িব না!

আপনি কি রাজী? আপনি রাজী হউন বা না হউন আমি রাজী।

দ্বিতীয় সংখ্যা

পলিটিক্‌স

শ্রীচরণেষু, আফিঙ্গ পাইয়াছি। অনেকটা আফিঙ্গ পাঠাইয়াছেন—শ্রীচরণকমলেষু। আপনার শ্রীচরণকমলযুগলেষু—আরও কিছু আফিঙ্গ পাঠাইবেন।

কিন্তু শ্রীচরণকমলযুগল যাইতে কমলাকান্তের প্রতি এমন কঠিন আজ্ঞা কি জন্য হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। আপনি লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে নয় আইনে অন্যত্র কিছু পলিটিক্স কম পড়িবে—তুমি কিছু পলিটিক্স্ ঝাড়িলে ভাল হয়। কেন মহাশয়? আমি কি দোষ করিয়াছি যে, পলিটিক্স্ সাবজেক্টরূপী ঝামা মাথায় মারিব? কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী ব্রাহ্মণ, তাহাকে পলিটিক্স্ লিখিবার আদেশ কেন করিয়াছেন! কমলাকান্ত স্বার্থপর নহে—আফিঙ্গ ভিন্ন জগতে আমার স্বার্থ নাই, আমার উপর পলিটিকেল চাপ কেন? আমি রাজা, না খোসামুদে, না জুয়াচ্চোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক যে, আমাকে পলিটিক্স্ লিখিতে বলে? আপনি আমার দপ্তর পাঠ করিয়াছেন। কোথায় আমার এমন স্থূলবুদ্ধির চিহ্ন পাইলেন যে, আমাকে পলিটিক্স্ লিখিতে বলেন? আফিঙ্গের জন্য আমি আপনার খোসামোদ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমি এমন স্বার্থপর চাটুকার অদ্যাপি হই নাই যে, পলিটিক্স্ লিখি! ধিক্ আপনার সম্পাদকতায়! ধিক্ আপনার আফিঙ্গদানে! আপনি আজও বুঝিতে পারেন নাই যে, কমলাকান্ত শর্মা উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশ্যন্ নহে।

অপনার এই আদেশ প্রাপ্তে বড়ই মনঃক্ষুণ্ন হইয়া, এক পতিত-বৃক্ষের কাণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া বঙ্গদর্শন সম্পাদকের বুদ্ধি-বৈপরীত্য ভাবিতেছিলাম। কি করি। ভরিটাক আফিঙ্গ গলদেশের অধোভাগে যেন-তেন প্রকারেণ ভরিলাম। সম্মুখে শিবে কলুর বাড়ির প্রাঙ্গণে দুই তিনটা বলদ বাঁধা আছে—মাটিতে পোঁতা নাদায় কলুপত্নীর হস্তমিশ্রিত খলিমিশান দলিত বিচালীচূর্ণ গোগণ মুদিত-নয়নে সুখের আবেশে কবলে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতেছিল। আমি কতকটা স্থিরচিত্ত হইলাম—এখানে ত পলিটিক্স্ নাই। এই নাদার মধ্য হইতে গোগণ পলিটিক্স্ বিকারশূন্য অকৃত্রিম সুখ পাইতেছে—দেখিয়া কিছু তৃপ্ত হইলাম, তখন অহিফেন-প্রসাদ-প্রসন্ন-চিত্তে লোকের এই পলিটিক্স্ প্রিয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আমার তখন বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার একটি গান মনে পড়িল।

'বোবার ইচ্ছে কথা ফুটে
খোঁড়ার ইচ্ছা বেড়ায় ছুটে,
তোমার ইচ্ছা বিদ্যা ঘটে,
ইচ্ছা বটে' ইত্যাদি।

আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্স্—হপ্তায় হপ্তায় রোজ রোজ পলিটিক্স্ কিন্তু বোবার বাক্‌চাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রুতগমনের আকাঙ্ক্ষার মত, অন্ধের চিত্রদর্শন-লালসার মত, হিন্দু বিধবার স্বামী প্রণয়াকাঙ্ক্ষার মত, আমার মনে আদরের আদরিণী গৃহিণীর আদরের সাধের মত হাস্যাস্পদ, ফলিবার নহে। তাই পলিটিক্স্ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী তোমাদিগকে হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ি আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স্ নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!" উহাই তাহাদিগের পলিটিক্স্। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স্ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এদেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে দেখিলাম, শিবু কলুর পৌত্র দশমবর্ষীয় বালক, এককাঁসি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটি শ্বেতকৃষ্ণ কুক্কুর তাহা দেখিল। দেখিয়া একবার দাঁড়াইয়া চাহিয়া ক্ষুণ্নমনে জিহ্বা নিষ্কৃত করিল। অমল-ধবল অন্নরাশি কাংস্যপাত্রে কুসুম-দামবৎ বিরাজ করিতেছে—কুক্কুরের পেটটা দেখিলাম নিতান্ত পড়িয়া আছে। কুক্কুর চাহিয়া চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একবার আড়মোড়া ভাঙিয়া হাই তুলিল তার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক একবার কলুর পুত্রের অন্নপরিপূরিত বদন-প্রতি আর নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়; অকস্মাৎ অহিফেন-প্রসাদে দিব্য চক্ষু লাভ করিলাম—দেখিলাম, এই ত পলিটিক্স্—এই কুক্কুর ত পলিটিশ্যন্। তখন মনোভিনিবেশ পূর্বক দেখিতে লাগিলাম যে

কুক্কুর পাকা পলিটিকেল্ চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুক্কুর দেখিল—কলুপুত্র কিছু বলে না—বড় সদাশয় বালক,—কুক্কুর কাছে গিয়া থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পৌত্রের মুখপানে চাহিয়া হ্যা হ্যা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল,—তাহার পলিটিকেল্ এজিটেশ্যন সফল হইল—কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া কুক্কুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুক্কুর আগ্রহ সহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাহা চর্বন, লেহন, গেলন এবং হজমকরণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল।

যখন সেই মৎস্যকণ্টক সম্বন্ধে এই সুমহৎ কার্য উত্তমরূপে সমাপন হইল তখন সেই সুচতুর পলিটিশ্যনের মনে হইল যে আর একখানা কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া পলিটিশ্যন্ আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল বালক আপন মনে গুড়তেঁতুল মাখিয়া ঘোররবে ভোজন করিতেছে—কুক্কুরপানে আর চাহে নাঃ তখন কুক্কুর Old একটি move অবলম্বন করিল, জাত পলিটিশ্যন্ না হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ্ সাহসে ভর করিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিল। আর একবার হাই তুলিল। তাহাতে কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুক্কুর মৃহ মৃহ শব্দ করিতে লাগিল। বোধহয় বলিতেছিল, "হে রাজাধিরাজ কলুপুত্র! কাঙ্গালের পেট ভরে নাই।" তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই, এক মুষ্টি ভাত কুক্কুরকে ফেলিয়া দিল। পুরন্দর যে সুখে নন্দন কাননে বসিয়া সুধা পান করেন, কার্ডিনেলের উল্‌সী বা কার্ডিনেল জেরেজ যে সুখে কার্ডিনেলের টুপী পরিয়াছিলেন কুক্কুর সেই সুখে সেই অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল। এমন সময়ে কলুগৃহিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ছেলের কাছে একটা কুক্কুর ম্যাক করিয়া ভাত খাইতেছে দেখিয়া কলুপত্নী রোষ-কষায়িত লোচনে এক ইষ্টকখণ্ড লইয়া কুক্কুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া লাঙ্গুল

সংগ্রহপূর্বক বহুবিধ রাগরাগিনী আলাপচারী করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল, যতক্ষণ ক্ষীণজীবী কুক্কুর উদরপূর্তির জন্য বহুবিধকৌশল করিতেছিল, ততক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোল-বিচালি পরিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাবনা খাইতেছিল—বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থূলাকায় দেখিয়া মুখ সরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতর নয়নে তাহার নৈপুণ্য দেখিতেছিল ; কুক্কুরকে দূরীভূত করিয়া কলুগৃহিণী এই দস্যুতা দেখিতে পাইয়া এক বংশখণ্ড লইয়া বৃষকে গোভাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে তৎপ্রতি ধাবমান হইলেন।

কিন্তু ভাগাড়ে যাওয়া দূরে থাকুক—বৃষ এক পদও সরিল না এবং কলুগৃহিণী নিকটবর্তিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া তাহার হৃদয়মধ্যে সেই শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। কলুপত্নী তখন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, বৃষ অবকাশ মতে নাদা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে ছুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমি ভাবিলাম যে এও পলিটিক্স্। ছুই রকমের পলিটিক্স্ দেখিলাম, এক কুক্কুরজাতীয়, আর বৃষজাতীয়। বিসমার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দরের পলিটিশ্যন্, আর উলসী হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাছুর পর্যন্ত অনেকে এই কুক্কুরের দরের পলিটিশ্যন্।

চতুর্থ সংখ্যা

কমলাকান্তের বিদায়

সম্পাদক মহাশয় !

বিদায় হইলাম, আর লিখব না। বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল না, আপনার সঙ্গে আর আমার বনিল না। আর কি লেখা হয় ? বেস্থরে কি এ বাঁশী বাজে। বাঁশী বাজি বাজি করে, তব

বাজে না—বাঁশী ফাটিয়াছে। আবার বাজ দেখি হৃদয়ের বংশী। হায়! তুই কি আর তেমন করিয়া বাজিতে জানিস? আর কি সে তার মনে আছে? না তুই সেই আছিস, না আমি সেই আছি! তুই ঘুণে ধরা বাঁশী—আমি ঘুণে ধরা—আমি ঘুণে ধরা, কি ছাই, তা আমি জানি না: আমার সে স্বর নাই—আর বাজাইব কি? আর সে রস নাই, শুনিবে কে? একবার বাজা দেখি হৃদয়! এ জগৎসংসারে—বধির অর্থচিন্তায় বিব্রত, মূঢ় জগৎসংসারে সেইরূপ আবার মনের লুকান কথাগুলি যেমন করিয়া বল দেখি? বলিলে কেহ শুনিবে কি? তখন বয়স ছিল—কতকাল হইল সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম—এখন সে বয়স, সে রস ছাড়া কেহ শুনিবে কি? আর সে বসন্ত নাই—এখন গলা-ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি?

হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ! আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি—কমলাকান্তের আর সে রস নাই! আমার সে নসীবাবু নাই—অহিফেনের অনাটন—সে প্রসন্ন কোথায় জানি না, তাহার সে মঙ্গলা গাভী কোথায় জানি না, সত্য বটে, আমি তখনও একা এখনও একা। কিন্তু তখন আমি একাই এক সহস্র—এখন আমি একায় আধখানা। কিন্তু একায় এত বন্ধন কেন? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম, মরিয়া গিয়াছে—তাহার জন্য আজও কাঁদি; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম—কবে শুকাইয়াছে, তাহার জন্য আজও কাঁদি, যে জলবিম্ব একবার জলস্রোতে সূর্যরশ্মিসম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম, তাহার জন্য আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী—তাহার এত বন্ধন কেন? এ দেহ পচিয়া উঠিল—ছাইভস্ম মনের বাঁধনগুলো পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—আগুন নেভে না কেন? ফুল শুকাইয়াছে—এখন গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল—এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে না কেন? ঝড় থামিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন? স্মৃতি কেন? জীবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে—যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে, পিণ্ডদান কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে,

যে কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে সঙ্গে গাহিত, ফুলের বিবাহ দিত, এখন আবার তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন? বাঁশী ফাটিয়াছে, আবার স, ঋ, গ, ম কেন। প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিঃশ্বাস কেন? সুর গিয়াছে ভাই, আর কান্না কেন! তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না!

অনুগত, স্বগত এবং বিগত
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী

কমলাকান্তের জবানবন্দী

খোসনবীশ জুনিয়ার প্রণীত

সেই আফিঙ্গখোর কমলাকান্তের অনেক দিন কোন সংবাদ পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ, সম্প্রতি এক দিন তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দেখিলাম। দেখি যে ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুজিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছে। মনে করিলাম, আর কিছু না, ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া কাহার ডিবিয়া হইতে আফিঙ্গ চুরি করিয়াছে—অন্য সামগ্রী কমলাকান্ত চুরি করিবে না, ইহা নিশ্চিত জানা। নিকটে একজন কালকোর্তা কনস্টেবল দেখিলাম। আমি দাঁড়াইলাম না, কি জানি যদি কমলাকান্ত জামিন হইতে বলে। তফাতে থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম যে কাণ্ডটা কি হয়।

কিছুকাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল। একজন কনস্টেবল রুল দেখাইয়া তাহাকে সঙ্গে নিয়ে গেল। আমি দুই একটি কথা শুনিয়া ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম।

এজলাসের মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি একজন দেশী ধর্মাবতার—পদে ও গৌরবে ডেপুটি; কমলাকান্ত আসামী নহে—সাক্ষী। মোকদ্দমা গোরু চুরি; ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটরায় পুরিয়া দিল।

তখন কমলাকান্ত হাসিতে লাগিল। চাপরাসী ধমকাইল—"হাস কেন?"

কমলাকান্ত জোড়হাত করিয়া বলিল, "বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে আমাকে এর ভিতর পুরিলে?"

চাপরাসী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন, বলিলেন, "তামাসার জায়গা এ নয়, হলফ পড়।"

কমলাকান্ত বলিল, "পড়াও না বাপু।"

একজন মুহুরি তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল, "বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া—"

কমলাকান্ত। (সবিস্ময়ে) কি বলিব?

মুহুরী। শুনতে পাও না—"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি, একথাটা বলতে হবে?

হাকিম। ক্ষতি কি? হলফের ফারমাই এই

কমলা। হুজুর সুবিচার বটে। কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা কথা বলিয়া আরম্ভ করিব, সেটা কি ভাল?

হাকিম। এর আবার মিথ্যা কথা কি?

কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, তত বুদ্ধি থাকলে তোমার কি এ 'পদবৃদ্ধি' হইত? প্রকাশ্যে বলিল, "ধর্মাবতাব, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয় আইনের চশমা নাকে দিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন—কিন্তু আমি এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ দেখিতেছে না—তখন কেমন করিয়া বলি, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—'

ফরিয়াদি উকিল চটিলেন, তাঁহার মূল্যবান সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে, তাহা এই দরিদ্র সাক্ষী নষ্ট করিতেছে। উকিল তখন গরম হইয়া বলিলেন—"সাক্ষী মহাশয়! Theological Lecture-টা ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাখিলে ভাল হয় না? এখানে আইনমত চলিতে মনস্থির করুন।

কমলা। আপনি যা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাই আমাকে বলিতে হইবে? আর কিছু বলিতে পারিব না?

উকিল। না।

কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, "বহুত খুব!" উকিল জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, তোমার নাম কি?

কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী।

উকিল। তোমার বাপের নাম কি?

কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল। উকিল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জাতি?

কমক্ষা। হিন্দু জাতি।

উকিল। আঃ! কোন্ বর্ণ?

কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

উকিল। দূর হোক ছাই! এমন সাক্ষী আনে? বলি—তোমার জাত আছে?

কমলা। মারে কে?

হাকিম দেখিলেন, উকিলের কথায় হইবে না, বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত হিন্দুর নানাপ্রকার জাত আছে, জান ত? তুমি তার কোন্ জাতির ভিতর?"

কমলা। ধর্মাবতার! এ উকিলের ধৃষ্টতা দেখিতেছেন, আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্তী—ইহাতেও যে উকিল বোঝেন নাই যে, আমি ব্রাহ্মণ ইহা আমি কি প্রকারে জানিব?

হাকিম লিখিলেন, জাতি ব্রাহ্মণ। তখন উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বয়স কত?

এজলাসে একটি ক্লক ছিল—তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বলিল, "আমার বয়স ৫১ বৎসর, দুই মাস তেরদিন, চারি ঘণ্টা পাঁচ মিনিট—"

উকিল। কি জ্বালা! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায়।

কমলা। কেন, এইমাত্র আইন মানিয়া চলিতে হইবে বললেন যে—কোন কথা গোপন করিব না।

উকিল। তোমার যা ইচ্ছা কর, আমি তোমায় পারি না। তোমার নিবাস কোথায় ?

কমলা। আমার নিবাস নাই।

উকিল। বলি, বাড়ি কোথা ?

কমলা। বাড়ি দূরে থাক, আমার একটা কুঠরীও নাই।

উকিল। একটা আড্ডা তো আছে ?

কমলা। ছিল, যখন নসীবাবু ছিলেন। এখন আর নাই !

উকিল। এখন আছ কোথা ?

কমলা। কেন, এই আদালতে।

হাকিম বলিলেন, আর বকাবকিতে কাজ নেই—আমি লিখিয়া লইতেছি, নিবাস নাই। তারপর ?

উকিল। তোমার পেশা কি ?

কমলা। আমার আবার পেশা কি ? আমি কি উকিল, বেশ্যা যে, আমার পেশা আছে ?

উকিল। বলি, খাও কি করিয়া ?

কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ করি।

উকিল। কি উপার্জন কর !

কমলা। এক পয়সাও না।

উকিল। তবে কি চুরি কর ?

কমলা। তাহা হইলে ইতিপূর্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপনি কিছু ভাগও পাইতেন।

উকিল তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া আদালতকে বলিলেন, "আমি এ সাক্ষী চাই না। আমি ইহার জবানবন্দী করাইতে পারিব না।"

প্রসন্ন বাদিনী উকিলের কোমর ধরিল, বলিল, এ সাক্ষী ছাড়া হইবে না। এ বামুন সত্য কথা বলিবে, তাহা আমি জানি—

কখনও মিথ্যা বলে না। উহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে জান না—তাই ও অমন করিতেছে। ও বামুনের আবার পেশা কি ? ও এর বাড়ি ওর বাড়ি খেয়ে বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, কি উপার্জন কর। ও কি বলিবে ?

উকিল তখন হাকিমকে বলিল, লিখুন, পেশা—ভিক্ষা।

এবার কমলাকান্ত রাগিল,—কি ? কমলাকান্ত চক্রবর্তী ভিক্ষোপজীবি ? আমি মুক্ত কণ্ঠে হলপের উপর বলিতেছি, আমি কখনও কাহারও কাছে এক পয়সা ভিক্ষা চাই না।

প্রসন্ন আর থাকিতে পারিল না, সে বলিল, সে কি ঠাকুর ! কখনও আফিঙ্গ চেয়ে খাও নাই ?

কমলা। দূর মাগী ধেমো গোয়ালার মেয়ে। আফিঙ্গ কি পয়সা ? আমি কখনও একটি পয়সা কাহারও কাছে ভিক্ষা লই নাই !

হাকিম হাসিয়া বলিলেন, কি লিখিব কমলাকান্ত ?

কমলাকান্ত নরম হইয়া বলিল, "লিখুন, পেশা ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ।" সকলে হাসিল—হাকিম তাই লিখিয়া লইলেন।

তখন উকিল মহাশয় মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ফরিয়াদীকে চেন ?"

কমলা। না !

প্রসন্ন হাঁকিল, "সে কি ঠাকুর। চিরকাল আমার দুধ-দই খেলে, আজ বল চিনি না ?"

কমলাকান্ত বলিল, তোমার দুধ-দই বিলক্ষণ চিনি, যখন দেখি এক পোয়া দুধে তিন পোয়া জল তখনই জানিতে পারি যে, এ প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ। যখনই দেখিতে পাই যে ঘোলের চেয়ে দধি ফিকে, তখনও চিনিতে পারি যে, এ প্রসন্নময়ীর দধি। দুধ-দধি চিনি নে ?"

প্রসন্ন নথ ঘুরাইয়া বলিল, "আমার দুধ-দই চেন আর আমায় চিনিতে পার না ?"

কমলাকান্ত বলিল, "মেয়েমানুষ কে কবে চিনিতে পেরেছে দিদি ?" বিশেষ গোয়ালার কাকালে যদি দুধের কেঁড়ে থাকিল, তবে কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে উঠে ?"

উকিল তখন আবার সওয়াল করিতে লাগিলেন "বুঝা গেল, তুমি বাদিনীকে চেন—উহার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে ?"

কমলা। মন্দ নয়—বামুনের ছেলেয় গোয়ালার মেয়েতেও আপনি একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

উকিল। এমন সম্বন্ধ কি হয় না ? কে জানে তুমি ওর পোষ্যপুত্র কি না ?

কমলা। ওর নয়, কিন্তু ওর গাইয়ের বটে।

উকিল। বুঝা গেল, তোমার সঙ্গে বাদিনীর একটা সম্বন্ধ আছে। একেবারে সাফ বলিলেই হইত—এত দুঃখ দাও কেন ? এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি এ মোকদ্দমার কি জান ?

কমলা। জানি যে, এ মোকদ্দমায় আপনি উকিল, প্রসন্ন ফরিয়াদী, আমি সাক্ষী, আর এই নেড়ে আসামী।

উকিল। তা নয়, গরুচুরির কি জান ?

কমলা। গরুচুরির আমার বাপ-দাদাও জানে না। বিদ্যাটা আমায় শিখাবেন ?—আমার দুধ-দধির বড় দরকার।

উকিল। আঃ—কি যন্ত্রণা ! বলি, প্রসন্ন গোয়ালিনীর গরু যখন চুরি যায়, তখন তুমি দেখিয়াছ ?

কমলা। না—চোর বেটার এত বুদ্ধি হয় নাই যে, আমাকে ডাকিয়া সাক্ষী রাখিয়া, গরুটা চুরি করে ! তাহা হইলে আপনারও কাজের সুবিধা হইত, আমারও কাজের সুবিধা হইত।

প্রসন্ন উকিলের কানে কানে বলিয়া দিল, "ও বামুন সে সব কিছুরই সাক্ষী নয়—ও কেবল গরু চেনে !"

উকিল তখন কূল পাইয়া গর্জিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি গরু চেন ?

কমলাকান্ত মধুর হাসিয়া বলিল, আহা চিনি বই কি, নইলে কি আপনার সঙ্গে এত মিষ্টালাপ করি?

হাকিম বলিলেন, ও সব রাখ। প্রসন্ন গোয়ালিনীর শামলা গাই আদালতের সম্মুখে মাঠে বাঁধা ছিল—দেখা যাইতেছিল। ডেপুটিবাবু সেই দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি 'এই গরুটি চেন?"

কমলাকান্ত জোড়হাত করিয়া বলিল, আপনি দেখিতেছেন একটি, আমি দেখিতেছি অনেকগুলি।

হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেখিতে পাইতেছ না—এ শামলা?"

কমলাকান্ত শামলা গাইয়ের দিকে না চাহিয়া উকিলের শামলার প্রতি চাহিয়া বলিল, এ শামলাও চুরির না কি?

কমলাকান্তের নষ্টামি হাকিম আর সহ্য করিতে পারিলেন না—বলিলেন, "তুমি আদালতের কাজের বড় বিঘ্ন করিতেছে—কণ্টেমপ্ট অফ কোর্ট-এর জন্য তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা।"

কমলাকান্ত আভূমিপ্রণত সেলাম করিয়া জোড়হাত করিয়া বলিল, "বহুত খুশ হুজুর। জরিমানা আদায়ের ভার কার প্রতি?"

হাকিম। কেন?

কমলা। কিরূপে আদায় করিবেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিব।

হাকিম। উপদেশের প্রয়োজন কি?

কমলা। ইহলোকে ত আমার নিকট জরিমানা আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই, তিনি, পরলোকে যাইতে প্রস্তুত কিনা জিজ্ঞাসা করিব।

হাকিম। জরিমানা না দিতে পার, কয়েদ যাইবে।

কমলা। কত দিনের জন্য ধর্মাবতার?

হাকিম। জরিমানা অনাদায়ে একমাস কয়েদ।

কমলা। দুইমাস হয় না?

হাকিম। বেশী মেয়াদের ইচ্ছা কেন?

কমলা। সময়টা কিছু মন্দা পড়িয়াছে—ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ আর তেমন সুলভ নয়—জেলখানায় যাহাতে মাস দুই ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হয় সে ব্যবস্থা যদি আপনি করেন, তবে গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায়।

হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তুমি সোজা বল—ঐ গরু তুমি চেন কিনা।"

কমলা। আমি বলি, শামলাওয়ালা—তা যাক—আমি ও শিংওয়ালা গরুটা চিনি। বিলক্ষণ আলাপ আছে।

উকিল। ও কার গরু?

কমলা। আমারই।

হরি হরি! প্রসন্নের মুখ শুকাইল। উকিল দেখিল, মোকদ্দমা যায়। প্রসন্ন তখন তর্জন গর্জন করিয়া বলিল, "তবে রে বিটলে! গরু তোমার?"

কমলাকান্ত বলিল, "আমার না তো কার? আমি ওর দুধ, দই, ঘোল, ছানা, মাখন, ননী খেয়েছি, ও গরু আমার হলো না, তুই বেটি পালিস ব'লে কি তোর বাবার গরু হলো?

উকিল অতটা বুঝিলেন না। বলিলেন, "ধর্মাবতার Witness hostile Permission দিন, আমি ওকে cross করি।"

কমলা। কি আমায় ক্রস করিবে? এই বলিয়া কমলাকান্ত চক্রবর্তী রাগে কাটরা হইতে নামিয়া যায়—চাপরাসী ধরিয়া আবার কাটরায় পুরিল। তখন কমলাকান্ত স্থির হইল—বলিল, "কর বাবা ক্রস কর। আমি অগাধ সমুদ্রে পড়িয়া আছি, যে ইচ্ছা, সে লম্ফ দাও—'অপামিবাধারমনু-ওরঙ্গম্!' উকিল মহাশয়, এ প্রশান্ত মহাসমুদ্র তরঙ্গ বিক্ষেপ করে না, "আপনি স্বচ্ছন্দে উলম্ফন করুন।"

উকিল তখন কোর্টকে বলিলেন, "ধর্মাবতার, দেখা যাইতেছে যে, এ ব্যক্তি বাতুল। বাতুল বলিয়া ইহার জবানবন্দী পরিত্যক্ত হইবে, ইহাকে বিদায় দেওয়া হউক।"

এমন সময়ে প্রসন্ন হাতজোড় করিয়া আদালতে নিবেদন করিল, যদি হুকুম হয়, তবে আমি স্বয়ং উহাকে গোটা কতক কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর বিদায় দিতে হয়, দিবেন।"

হাকিম কৌতূহলী হইয়া অনুমতি দিলেন। প্রসন্ন তখন কমলাকান্তের প্রতি চাহিয়া বলিল, "ঠাকুর! মৌতাতের সময় হয়েছে না?

কমলা। মৌতাতের আবার সময় কি রে বেটি, "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যাং নেশাঞ্চ চিন্তয়েৎ।

প্রসন্ন। অং বং এখন রাখ—এখন মৌতাত করিবে?

কমলা। দে।

প্রসন্ন। আচ্ছা, আগে কথার উত্তর দাও, তারপর সে হবে।

কমলা। তবে জলদি জলদি বল—জলদি জলদি জবাব দিই।

প্রসন্ন। ও গরু আমার কি না?

কমলা। তুই ওর এক বিন্দু দুধ খেলি নে, বেচে মরলি, গরু তোর হলো? ও গরু যদি তোর হয় তবে বাঙ্গাল বেঙ্কের টাকা আমার। দে বেটি, গরু চোরকে ছেড়ে দে। গরীবের ছেলে দুধ খেয়ে বাঁচুক।

হাকিম উভয়কে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসাবাদ নিজহস্তে লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রসন্ন এই গরুর দুধ বেচে?"

কমলা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাদিনীর উকিল তখন বললেন, আমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে—আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই না।" এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তখন আসামীর উকিল গাত্রোত্থান করিলেন। দেখিয়া কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার তুমি কে?

"আমি আসামী পক্ষের উকিল, তোমাকে ক্রস করিব।"

কমলা। একজন ত ক্রস করিয়া গেল, আবার তুমি কুমার বাহাদুর এলে নাকি?

উকিল। কুমার বাহাদুর কে?

কমলা। রাজপুত্রকে চেন না? ত্রেতাযুগে আগে ক্রস করিলেন পবনাঙ্গজ মহাশয়। তারপর ক্রস করিলেন কুমার বাহাদুর।

উকিল। ওসব রাখ—তুমি গরু চেন বলেছ—কিসে চেন?

কমলা। কখন শিঙে—কখন শামলায়।

উকিল রাগিয়া উঠিয়া; গর্জন করিয়া টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, "তোমার পাগলামী রাখ—তুমি এই গরু চিনিতে পারিতেছ কিসে?"

কমলা। ঐ হাম্বা-রবে।

উকিল হতাশ হইয়া বলিলেন, "Hopeless!" উকিল মহাশয় বসিলেন, আর জেরা করিবেন না। কমলাকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "দড়ি ছেড় কেন বাবা?"

উকিল আর জেরা করিলেন না দেখিয়া হাকিম কমলাকান্তকে বিদায় দিলেন। কমলাকান্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইল। আমি কিছু কাজ সারিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, কমলাকান্ত খেলো হুঁকো হাতে করিয়া বসিয়া আছে। চারিদিকে লোক জমিয়াছে। প্রসন্নও সেখানে আসিয়াছে। কমলাকান্ত তাহাকে তিরস্কার করিতেছে "তোর মঙ্গলার বাঁটের দিব্য—তোর দুধের কেঁড়ের দিব্য—তোর ঘোলমউনির দিব্য, তোর ফাঁদি নথের দিব্য, তুই যদি চোরকে গরু ছেড়ে না দিস—"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"চক্রবর্তী মহাশয়! চোরকে গরু ছাড়িয়া দিবে কেন?"

কমলাকান্ত বলিল, "পূর্বকালে মহারাজ শ্যেনজিৎকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল, হে বৎস। গোপস্বামী ও তস্কর ইহাদের মধ্যে যে গরুর দুগ্ধ পান করে সেই তাহার যথার্থ অধিকারী। অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই হলো ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law, আর ইহাই এখানকার ইউরোপের International Law, যদি সভ্য উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। 'গো' শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করভোগ্য। সেকন্দর হইতে রণজিৎ সিংহ পর্যন্ত সকল তস্কর ইহার প্রমাণ। Right of

conquest যদি একটা Right হয়, তবে Right of theft কি একটা Right নয়? অতএব হে প্রসন্ন নামে গোপকন্যা! তুমি আইনমতে কার্য কর। ঐতিহাসিক রাজনীতির অনুবর্ত্তী হও। চোরকে গরু ছাড়িয়া দাও।

এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চলিয়া গেল। দেখিলাম মনুষ্যটি নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

সমাপ্ত